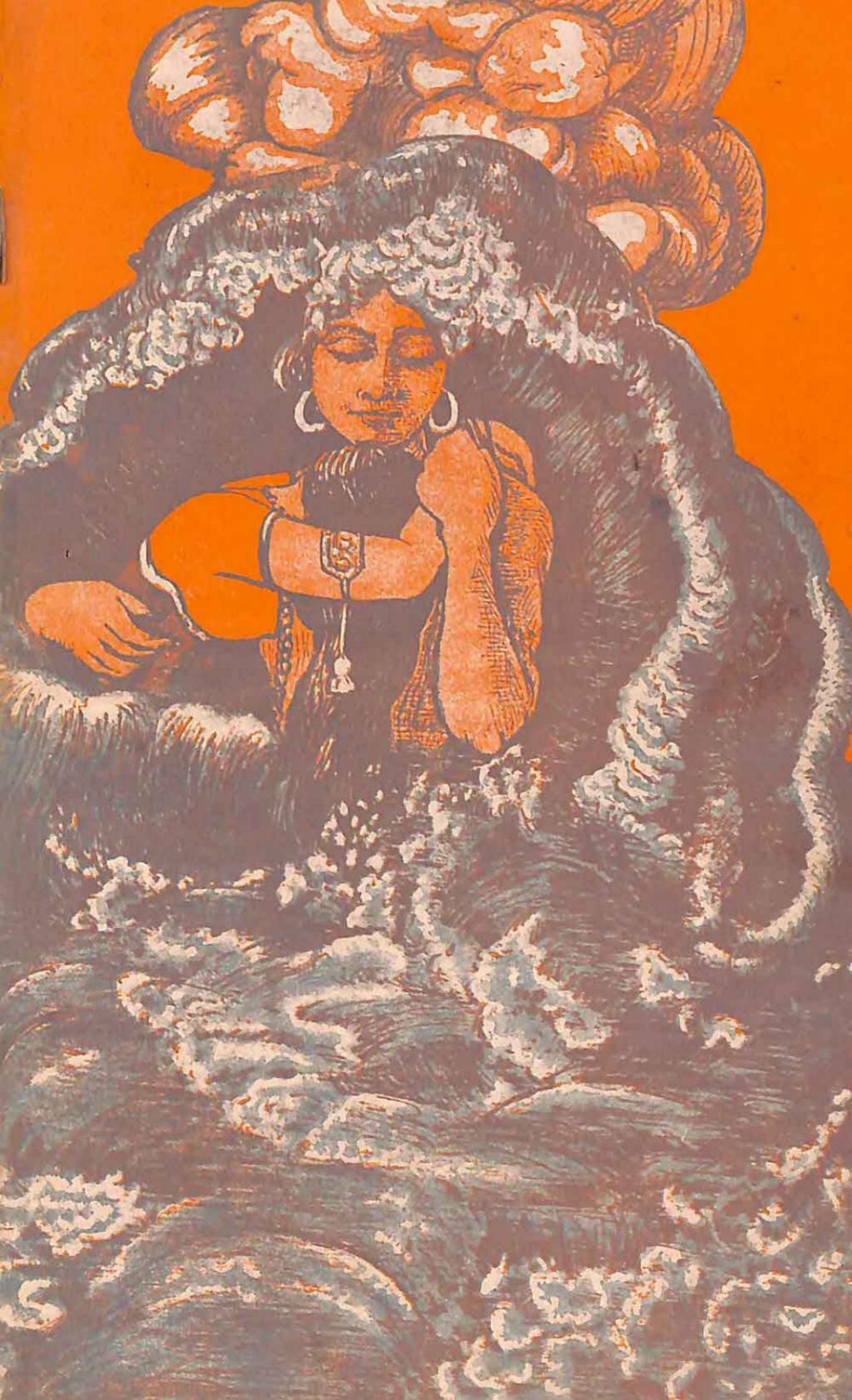


ପର୍ବତ କଳ୍ପା

ଶ୍ରୀନୃପେନ୍ଦ୍ରକଙ୍କ ଚଢ୍ରୋପାଧ୍ୟାୟ







~~2471~~
~~5976~~

2/741

ମେଣ୍ଡ କନ୍ୟା

ଆନ୍ତିମପଦ୍ଧର୍ମ କନ୍ୟା ଚଢ଼ୋପାର୍ଥୀଙ୍କୁ



শরৎচন্দ্র পাল প্রতিষ্ঠিত
উজ্জল-সাহিত্য-মন্দির

প্রকাশক—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাল
ব্রহ্মপুরী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—

শ্রীমুরোহননাথ দাস
বাণীকুপা প্রেস
ঢাকা, মনমোহন বন্ধু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচন্দচিত্র—

শ্রীবলাহিবন্ধু রায়

পরিকল্পনা—

শ্রীসত্যনারায়ণ দে

দ্বিতীয় সংস্করণ
আবণ, ১৩৬৯

হ'টাকা।



শরৎচন্দ্র পাল প্রতিষ্ঠিত
উজ্জল-সাহিত্য-মন্দির

প্রকাশক—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাল

ব্রহ্মপুরী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—

শ্রীমুরোহননাথ দাস

বাণীকুপা প্রেস

ঢাকা, মনমোহন বন্ধু স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

প্রচন্দচিত্র—

শ্রীবলাহিবন্ধু রায়

পরিকল্পনা—

শ্রীসত্যনারায়ণ দে

দ্বিতীয় সংস্করণ

আবণ, ১৩৬৯

হ'টাকা।

শরৎচন্দ্র পাল প্রতিষ্ঠিত
উজ্জল-সাহিত্য-মন্দির

প্রকাশক—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাল

ব্রহ্মপুরী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—

শ্রীমুরোহননাথ দাস

বাণীকুপা প্রেস

ঢাকা, মনমোহন বন্ধু স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

প্রচন্দচিত্র—

শ্রীবলাহিবন্ধু রায়

পরিকল্পনা—

শ্রীসত্যনারায়ণ দে

দ্বিতীয় সংস্করণ

আবণ, ১৩৬৯

হ'টাকা।

~~2471~~

~~5976~~

~~3/141~~



ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ କଣ୍ଠକର୍ମ ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ
ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ କଣ୍ଠକର୍ମ ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ
ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ କଣ୍ଠକର୍ମ ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ
କଣ୍ଠକର୍ମ ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ କଣ୍ଠକର୍ମ ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ
କଣ୍ଠକର୍ମ ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ କଣ୍ଠକର୍ମ ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠ ସ୍ମରଣିତାମ্

ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ କଣ୍ଠକର୍ମ ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ
ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ କଣ୍ଠକର୍ମ ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ

ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ କଣ୍ଠକର୍ମ ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ
ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ କଣ୍ଠକର୍ମ ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ
ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ କଣ୍ଠକର୍ମ ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ
ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ କଣ୍ଠକର୍ମ ପାତ୍ରାନ୍ତାନୀ

ভূমিকা

আমাদের পুরাণে পঞ্চকন্তাকে নিত্যশ্রীকায়
স্মরণ করার নির্দেশ আছে...

পুরাণকার যে পাঁচটি কন্তাকে এই শ্রীকায়
আসন দিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই পৌরাণিক-
জগতের অধিবাসী...

পৃথিবী তারপর বহুদূর এগিয়ে এসেছে...
নর-নারীর জীবনে এসেছে বহুতর নতুন সমস্যা,
বহুতর নতুন আদর্শের সংঘাত... তার ফলে
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন নতুন সব নর-
নারীর চরিত্র...

এই সব আধুনিক চরিত্রের মহিমা
পৌরাণিক চরিত্রগুলির মহিমার কিছু কম
নয়...

তাই এই বইটিতে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক
জীবন থেকে পাঁচটি অপরূপ নারীর চরিত্র ও
কাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছে...

এই সংগ্রহের যদি কোনো মূল্য থাকে,
তার জন্যে লেখকের চেয়ে এই বই-এর

প্রকাশকের কৃতিত্ব চের বেশী। শ্রীমান
কিরীটি পাল শুধু সাহিত্য-রসিক নন, নিজে
একজন সাহিত্যিক...সাহিত্যের প্রতি তাঁর
সহজাত এক প্রবল আকর্ষণ আছে বলেই
রোদ-বৃষ্টি-বড় এবং লেখকের উদাসীনতাকে
উপেক্ষা ক'রে এই বই-এর প্রকাশনকে সম্ভব
ক'রে তুলেছেন।

তাঁর ধৈর্য ও চেষ্টা সার্থক হোক, এই
কামনাই করি।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

৫৯৭৬



~~2471~~
~~5975~~

~~5/171~~



শকুন্তলা

[কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'-কে অনুসরণ ক'রে এই কাহিনী রচিত]

মালিনীর তৌরে একদিন

নদীর নাম মালিনী !

মালিনীর তৌরে ঘন সবুজ বনে সহসা জেগে ওঠে রথের চাকার
আর্তনাদ !

প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে একটি কৃষ্ণসার মৃগ হঠাত থমকে থেমে
ভীত আর্ত-চোখে পেছন দিকে চেয়ে দেখে... ভয়-বিকল মুখ থেকে
আর্দ্ধভুক্ত তৃণাঙ্কুর আপনা থেকে প'ড়ে প'ড়ে যায়...

রথের শব্দ এগিয়ে আসে... সে আবার ছুটতে আরম্ভ করে...

রথ তাকে প্রায় ধ'রে ফেলে...

রথে আরাঢ় শিকারী ধরুকে বাণ যোজনা করেন...

এমন সময় আর্তকষ্টে কে চীৎকার ক'রে উঠলো, থামুন !

থামুন !

শিকারীর ইঙ্গিতে সারথী রথের গতি শ্রদ্ধ করে...

শিকারী দেখেন, সামনে আশ্রমবাসী এক তপস্বী।

তবে কি মৃগয়ার পেছনে ছুটতে ছুটতে অরণ্য থেকে তপোবনে
এসে পড়েছেন ?

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠୀ

ତପସ୍ତୀ ରଥେର କାହେ ଏଗିଯେ ଏସେ ଶିକାରୀକେ ଚିନତେ ପାରେନ,
ଶିକାରୀର ଅଙ୍ଗେ ରାଜ-ବେଶ !

—ଏ ଆଶ୍ରମ-ମୂଳ, ରାଜା ! ରାଜାର ଅନ୍ତର ଆର୍ତ୍ତ-ଆଗେର ଜଣ୍ଟେ,
ନିରୀହେର ନିପୀଡ଼ନେର ଜଣ୍ଟେ ନୟ !

ରାଜା ଦୁଷ୍ଟ ଧର୍ମବୀଗ ନାମିଯେ ରାଖେନ ।

ତୃପ୍ତ ହନ ତପସ୍ତୀ । ଆଶୀର୍ବାଦ କରେନ, ଆଶ୍ରମବାସୀ ତପସ୍ତୀର
କଥାଯ ଆପନି ଏହିଭାବେ ଧର୍ମବୀଗ ନାମିଯେ ରାଖଲେନ, ଏ ପୁରୁବଙ୍ଶେର
ରାଜାରଇ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି, ଏମନି ଗୁଣବାନ ରାଜ-
ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରନ !

ଦୁଷ୍ଟ ନୀରବେ ହାସେନ...ଅପୁତ୍ରକ ତିନି, କୋଥାଯ ପୁତ୍ର-ସନ୍ତାବନା ?
ଅଦୃଶ୍ୟେ ହାସେନ ବିଧାତା ।

ତପସ୍ତୀ ସମ୍ମାନେ ରାଜା ରଥ ଥେକେ ନେମେ କୁଣ୍ଡିତକଟ୍ଟେ ବଲେନ,
ବୁଝାତେ ପାରିନି ସାମନେ ତପୋବନ !

ତପସ୍ତୀ ବଲେନ, ସାମନେଇ କୁଳପତି ମହର୍ଷି କଥେର ଆଶ୍ରମ...ଆମି
ସମ୍ବିଧ-ସଂଗ୍ରହେ ଯାଛି, ନଇଲେ ଆପନାକେ ମନ୍ଦେ କ'ରେ ନିଯେ ଯେତାମ !

—ମହର୍ଷି କି ଆଶ୍ରମେଇ ଆହେନ ଏଥନ ?

—ନା । ଆଶ୍ରମେର ଆତିଥ୍ୟେର ଭାର ତାର କଣ୍ଠା ଶକୁନ୍ତଲାର ଓପର
ଦିଯେ ତିନି ସମ୍ପ୍ରତି ଭ୍ରତ-ଉଦ୍ୟାପନ-ଉପଲକ୍ଷେ ସୋମତୌର୍ଥେ ଗିଯେଛେନ ।

ରାଜା ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଖେ ଈସ୍‌ ଦିଧାର ରେଖା ଫୁଟେ ଓଠେ । ତପସ୍ତୀ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେନ ।

—ଦିଧାର କୋନୋ କାରଣ ନେଇ...ଆପନାର ଆତିଥ୍ୟେର କୋନୋ
କ୍ରଟୀ ହବେ ନା । ଆଶ୍ରମେର ଏତ କାହେ ଏସେ ଯଦି ଆଶ୍ରମେ ପଦାର୍ପଣ
ନା କ'ରେ ଫିରେ ଯାନ, ମମନ୍ତ ତପୋବନ ଫୁଲ ହବେ !

—ଆତିଥ୍ୟେର କ୍ରଟୀର କଥା ଆମି ଭାବିନି, ଆମି ଭାବଛି ଆମାର

পঞ্চকন্তা

ছুর্ভাগ্যের কথা... মহর্ষির আশ্রমে যাবো অথচ মহর্ষির দর্শন পাবো না !
নিরূপায় যখন, মহর্ষির কন্তার কাছেই আমার ভক্তি নিবেদন ক'রে
যাবো, তিনি নিশ্চয়ই আমার হয়ে মহর্ষিকে তা পেঁচে দেবেন !

—তার কোনো কৃটি হবে না ।

তপস্থী সমিধ-সংগ্রহে চলে যান..

রাজা সামনের দিকে চেয়ে দেখেন, সবুজ পাতার আড়াল থেকে
দেখা যায় অদূরে মালিনীর তীরে মহর্ষি কথের আশ্রম...

রথ থেকে নেমে দুষ্প্রস্তুত ধর্মৰ্বাণ আর তৃণ সারথির হাতে দেন,
অঙ্গ থেকে রাজ-আভরণ সব খুলে ফেলেন... বাহু থেকে রাজ-বলয়
খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাহু কেঁপে ওঠে !

যুগয়ায় বন্দ দৃষ্টি, অরণ্যের মধ্যে শুধু যুগকেই দেখেছে... এতক্ষণে
চোখে পড়ে অরণ্য... চোখে পড়ে অরণ্য আর তপোবনের পার্থক্য...

মাথার ওপর গাছের কোটির থেকে মাটিতে ঝ'রে পড়েছে শুক-
পাখীর ঠোঁট থেকে সন্দৃ-সংগৃহীত সবুজ ধানের শীষ ..

গাছের তলায় স্নিঙ্খ মশুল শিলাখণ্ড প'ড়ে, তাতে এখনো
রয়েছে ইঙ্গুদী-ফলের চূর্ণ-অবশেষ... স্নানের সময় আশ্রম-কন্তারা এই
সব শিলাখণ্ডে ইঙ্গুদী-ফল চূর্ণ করেন, কেশ-তৈলের জন্যে... স্নেহসিক্ত
শিলাখণ্ড রৌদ্রকরে বিকমিক করছে...

সামনে, একান্ত নিকটে ঝোপের আড়াল থেকে ছুটি যুগশিশু
নিঃশঙ্খ-দৃষ্টিতে ঘাড় বেঁকিয়ে রাজাকে দেখছে, তারা তপোবন-যুগ...
মানুষ দেখলে ভয়ে পালায় না !

নীচে পায়ের দিকে চেয়ে দেখেন, সবুজ ঘাসের ফাঁকে ছোট
বনপথ গাছের তলা দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে... স্নানান্তে ঝবিরা
পথের ধারের এই সব গাছে বক্ল শুকোতে দেন সেই সব বক্ল

পঞ্চকন্ত্র।

থেকে জল চুঁয়ে প'ড়ে প'ড়ে পথের ধূলোয় একটা স্থায়ী রেখা
এঁকেছে...আশ্রমে পৌছোবার যেন পথ-নির্দেশ !

—আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি, তুমি এইখানে অপেক্ষা করো !

ঝরা-বক্লের-রেখাক্ষিত পথ ধ'রে রাজ-আভরণহীন রাজা দুষ্মন্ত
আশ্রমের দিকে এগিয়ে চলেন...

আশ্রমের কাছাকাছি পৌছোতেই দুষ্মন্ত থমকে দাঢ়িয়ে
পড়েন...কানে আসে মৃছ নারী-কষ্ট !

—ইদো ইদো সহি ও ! এইদিকে, এইদিকে সখি !

কে ডাকে ? কাকে ?

শব্দ অহুসরণ ক'রে দুষ্মন্ত গাছের আড়াল থেকে চেয়ে দেখেন...
দেখেন, সামনে কুসুম-বনে দুর্লভ-দেহা আশ্রম-ছহিতারা আধ-
মুকুলিত সমবয়সী গাছে জল সেচন করছেন...

মুঞ্খবিশ্বয়ে দুষ্মন্ত সেচন-রতা বনলতাদের দিকে চেয়ে থাকেন...
এই জীবনে তিনি প্রথম দেখলেন, উত্থান-লতার রূপ-গৌরব ম্লান
ক'রে দিলো বনলতা !

ঝুঁঝির আশ্রমে কোথা থেকে এলো এই দুরস্ত রূপ ? কে এরা ?

—হলা সউন্তলে !

দুষ্মন্ত নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে দেখেন...সখির সঙ্ঘোধনে শকুন্তলা
ঘাড় তুলে চায় !

—এই নব-মল্লিকার কাছে তুই হেরে গিয়েছিস্ শকুন্তলা !

—কেন ?

—তুইও যেমন মহর্ষির কণ্ঠা, এই নব-মল্লিকা তরঢিকেও মহর্ষি
তেমনি কণ্ঠা ব'লে ডাকেন...কিন্তু তোর চেয়ে এই নব-মল্লিকাকেই
বেশী ভালোবাসেন !

পঞ্চকন্তা

—কেন অনসূয়া একথা বলচিস্ ?

—বলবো না ? নব-মল্লিকার চেয়ে কোমল তুই, অথচ তোর ওপর ভার দিয়ে গেলেন নব-মল্লিকার সেবার !

—তুই ভুল করচিস্ অনসূয়া ! আমি এদের ভালোবাসি বলেই এদের সেবা করছি...আর বাবা সেকথা জানেন বলেই এদের ভার আমার ওপর দিয়ে গিয়েছেন ! তুই আর প্রিয়স্বদা আমার সখী, এরা যে আমার সহোদরা !

এই শকুন্তলা ! মহৰ্ষি কথের কন্তা ! হায় ঝঘি, তপস্তার আগ্নের শিখায় এ নব-মল্লিকা কি ক'রে মুকুলিত হবে !

জলসেচন করতে করতে শকুন্তলা এগিয়ে আসে, দুঃস্মন্তের দৃষ্টি পায়ে-পায়ে শকুন্তলাকে অনুসরণ করে...

সেচন-ঘট নামিয়ে রেখে ক্লান্ত তন্ত্র-দেহকে সোজা ক'রে শকুন্তলা অনসূয়াকে ডাকে, দেখচিস্ প্রিয়স্বদার কাণ ! বক্ষল এমন শক্ত ক'রে বেঁধেছে...এই ঢাখ...ব্যথা লাগছে...গ্রহিষ্ঠী একটু আল্গা ক'রে দে !

এই ব'লে পীনোন্নত বক্ষ এগিয়ে ধরে...

দুঃস্মন্তের অন্তরে সহসা সপ্ত সমুজ্জ উদ্বেল হয়ে ওঠে !

প্রিয়স্বদা তিরক্ষার করে, ওলো সখি, আমার গ্রহি-বাঁধার দোষ নয়, দোষ তোমার যৌবনের ! পলে পলে সে আত্মবিস্তার ক'রে চলেছে, আমি কি করবো বলো ?

অন্তরাল থেকে দুঃস্মন্তের মনে হয় তিনি যেন চীৎকার ক'রে প্রতিবাদ ক'রে উঠেন, এ অন্তায় ! তপস্তায়-শুক্ষ-ঝঘি না হ'লে এ অঙ্গে কে বক্ষল পরায় !

কিন্তু পরমুহুর্তেই মনে হয়, বোধহয় বক্ষলে এ তন্তুর মহিমা আরো বেড়েছে !

পঞ্চকন্ত্র

সারা দেহ দিয়ে দুঃস্থি আজ দেহকেই দেখেন !

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় বকুলের তরংণ শাখারা ছুলে ওঠে...আনন্দে
তার শিহরণ লাগে শকুন্তলার দেহে...

—ঢাখ্, ঢাখ্ সখি, নব-পল্লবের আঙুল দিয়ে বকুল আগাকে
ডাকছে !

শকুন্তলা বকুলের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়...নব-পল্লবের মর্মর যেন
জেগে ওঠে তার নিজের দেহে...বাতাস ভ'রে যায় বরা বকুলের গন্ধে...

শকুন্তলাকে বকুলের কাছে ছুটে যেতে দেখে প্রিয়মন্দা হেসে
বলে, ভালো হলো, তরংণ বকুলের সাধ মিটলো...মুকুলিত লতার
স্পর্শ পেলো !

বকুলকে ছেড়ে শকুন্তলা প্রিয়মন্দাকে জড়িয়ে ধরে, পিঅবেদা সি
তুমং ! সত্যিই তুই প্রিয়ং-বদা !

এমন সময় অনসূয়া চীৎকার ক'রে ওঠে, সখি, সখি, এদিকে
আয়, দেখে যা কাণ !

শকুন্তলা ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে, অনসূয়া তার প্রিয় নব-মল্লিকার
সামনে দাঁড়িয়ে...

—তোর বনজ্যোৎস্নার কাণ ঢাখ্ ! শকুন্তলা সেই নব-মল্লিকার
নাম রেখেছিল বনজ্যোৎস্না !

অনসূয়া হেসে বলে, আজ তোর নব-মল্লিকায় প্রথম ফুল
ফুটেছে, আর ঢাখ্, সঙ্গে সঙ্গে সহকার এসে তাকে বেষ্টন করেছে !

মুঢ়-দৃষ্টিতে শকুন্তলা চেয়ে দেখে নব-মল্লিকা আর সহকারে
প্রথম মিলন !

দেখতে দেখতে সহসা কোথা থেকে লজ্জা এসে নৌরবে ছই
গঙ্গকে আরভিম ক'রে তোলে...

প্রিয়মন্দা-অনসূয়া হেসে ওঠে, কি দেখছিস অমন মুঢ় হয়ে ?

পঞ্চকন্তা

শকুন্তলা লজ্জায় বিব্রত হয়ে পড়ে...সেই স্মরণে এক অমর
বিকশিত নব-মল্লিকাকে ফেলে ছুটে আসে শকুন্তলার রক্ত-গণের
দিকে...

আত্মরক্ষার জন্যে শকুন্তলা যেদিকে ছুটে যায়, অমর সেইদিকেই
আক্রমণ করে...

অসহায় শকুন্তলা আর্তনাদ ক'রে ওঠে, এই নির্লজ্জের হাত
থেকে আমাকে বাঁচা...আমাকে বাঁচা ওরে !

অনন্ত্যা বিজ্ঞপ ক'রে ওঠে, আমরা বাঁচাবার কে ? তপোবন
রক্ষা হলো—রাজার কাজ...রাজাকে ডাকো সখি...চীৎকার ক'রে
ডাকো রাজা দুষ্প্রত্যক্ষে !

আড়াল থেকে দুষ্প্রত্যক্ষে ওঠেন, আত্মপ্রকাশের এই অপূর্ব
লগ্ন স্বয়ং বিধাতা এনে দিয়েছেন !

আর্ত-ত্রাণের মহাকর্তব্যে উদ্বৃদ্ধ হয়ে গাছের আড়াল থেকে বীর-
মহিমায় রাজা দুষ্প্রত্যক্ষে আত্মপ্রকাশ ক'রে বলেন, কার এতবড় সাহস—
দুষ্প্রত্যক্ষের রাজে তাপ্স-দুষ্প্রত্যক্ষের উৎপীড়ন করে ?

সেই অকস্মাত আবির্ভাবে শকুন্তলা বিহ্বল হয়ে পড়ে...উচ্চত-
দৃষ্টি নামাতে পর্যন্ত পারে না !

অনন্ত্যা শুধু নিজেকে সামলে নেয়, হেসে নবাগতের দিকে
চায়...

স্থির-মূর্তি শকুন্তলার দিক থেকে দুষ্প্রত্যক্ষে অনন্ত্যার দিকে চান,—
উৎপীড়নকারী কোথায় ?

রসিকা অনন্ত্যা হেসে বলে, শান্ত হোন...উৎপীড়নকারী সামান্য
একটা অমর...আমাদের সখিকে বড় ঝালাতন করছিল, তাই...
আপনার পরিচয় জানতে পারি কি ?

—পরিচয়...আমার...মানে...

পঞ্চকন্যা

সত্যপরিচয় দিতে গিয়ে গোপন-মনে কোথায় বাধা লাগে !
ভয় হয়, রাজ-পরিচয় শুনে যদি...

তাই বলেন, রাজা দুঃখন্তেরই প্রতিনিধি আমি... তপোবনে
তপস্যীরা নিবিষ্টে আছেন কিনা দেখবার জন্মেই আমি এসেছি।

অনসূয়া ঘৃত হেসে বলে, আপনাকে দেখে ভরসা হচ্ছে, আমরা
অনাশ্রয় নই !

অনসূয়ার কথার ইঙ্গিতে দুঃখন্ত মনে ভরসা পান... শকুন্তলার
দিকে চেয়ে দেখতেই শকুন্তলা আবার চোখ নত করে... সেই এক-
মুহূর্তের মৌন-দৃষ্টি দুঃখন্তের অন্তরে শতকথায় মুখর হয়ে ওঠে !

অনসূয়ার দিকে ফিরে বলেন, আমারও কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে?
—বলুন !

—তপস্যীর আশ্রমে এই রূপ-সমাজের আপনাদের পরিচয়
জানতে পারি কি ?

—ইনি শকুন্তলা, মহর্ষি কথের কন্যা... আমরা শকুন্তলার সখি !

—কিন্তু মহর্ষি কথি তো আজন্ম ব্রহ্মচারী...

—শকুন্তলা তাঁর পালিতা-কন্যা... অস্মরী মেনকার পরিত্যক্ত
কন্যা...

নিঃসঙ্কেচে দুঃখন্ত ব'লে ওঠেন, তাই... তাই বলুন... এ বিদ্যুৎ
তো মাটিতে জন্মায় না !

চলে যাবাব জন্মে শকুন্তলা প্রাণপণ চেষ্টা করে, বলে—

—আমি চল্লম, সখি !

কিন্তু এক-পাও অগ্রসর হতে পারে না !

—চলে গেলেই হলো ? অনসূয়া পথরোধ ক'রে দাঢ়ায়...

—মহর্ষি তোমার ওপরই অতিথি-সেবার ভার দিয়ে গেছেন...

অতিথি যদি ক্ষুঁশ হয়ে ফিরে যান...

পঞ্চকন্ত্রা

তুম্ভন্ত ব্যথিতকষ্টে ব'লে ওঠেন, না, না...আমি তৃপ্তি...কিন্তু
আর-একটা কথা আমি জানতে চাই

—নিঃসঙ্গেচে বলতে পারেন !

—বক্লধারিগী আপনাদের সখিকে দেখে মনে হচ্ছে, মহৰি কখন
তাকেও তপস্যার তুরহ পথে...

—উহুঁ ! বক্লে প্রতারিত হবেন না...মহৰি শকুন্তলার জগ্নে
উপযুক্ত পাত্র খুঁজছেন...

শকুন্তলার চোখে আকুটি ফুটে ওঠে...

—আমি আর্য্যা গৌতমীর কাছে এখনি যাচ্ছি...

অনসূয়া পথ রোধ ক'রে দাঢ়ায়...

—আর্য্যা গৌতমীর কাছে কেন ?

—তোমার শাসন দরকার...যেখানে-সেখানে তুমি যা তা বলো !
পথ ছাড়ো !

—পথ ছাড়বো, কিন্তু তার আগে তুমি আমার খণ্ণ শোধ ক'রে
যাও !

—কিম্বের খণ্ণ ?

—আমি তোমার হয়ে তু'কলসী জল সেচন করেছি—সেই
তু'কলসী জল তুমি আমাকে তুলে দিয়ে যাও !

তুম্ভন্ত এগিয়ে আসেন...

অনসূয়ার দিকে চেয়ে বিনীতকষ্টে বলেন, আমার এই আংটি
আপনি প্রতিভৃত রাখুন...আমি আপনার সখির হয়ে খণ্ণ শোধ ক'রে
দেবো ! উনি ক্লান্ত ...

অনসূয়া হেসে আংটিটা নিয়ে দেখে, তাতে রাজা তুম্ভন্তের নাম
লেখা !

স্নিঘদৃষ্টি দিয়ে আপাদমস্তক সেই দিব্য-মূর্তি অতিথিকে দেখে

পঞ্চকন্তা

নিয়ে অনসূয়া আংটি ফিরিয়ে দেয়, আংটি আপনার কাছেই থাক্...
আপনার কথাতেই আমি বিশ্বাস করছি !

এমন সময় সমস্ত তপোবনকে মথিত ক'রে চারদিক থেকে আর্ত-
কলরোল জেগে ওঠে !

কাছেই গাছের ওপর থেকে কোনো সন্ধ্যাসী আশ্রমবাসীদের
সতর্ক করবার জগ্নে তারস্তের চীৎকার ক'রে ওঠেন, সাবধান !
সাবধান ! রাজা দুষ্প্রসূ মৃগয়ায় মন্ত হয়ে সৈন্যে তপোবনের ধারে
এসে পড়েছেন... তাঁর সৈন্যদের দেখে এক বন্ধুহস্তী উন্মত হয়ে
আশ্রমের দিকে ছুটে আসছে... ভয়ে আশ্রমবাসীরা সব পালাচ্ছে...
সাবধান ! সাবধান !

দুষ্প্রসূ বুঝতে পারেন, তাঁর বিলম্ব দেখে সৈন্যেরা তাঁকে খুঁজতে
বেরিয়েছে... তাই এই অনর্থ !

ভীতা আশ্রম-দুর্হিতাদের দিকে চেয়ে বলেন, কোনো ভয় নেই
আপনাদের ! আমি এখনি এর প্রতিবিধান করছি।

মুছ হেসে অনসূয়া বলে, সে আমি জানি, সে শক্তি আপনার
আছে ! কিন্তু অতিথি-সৎকারের স্বয়েগ না দিয়েই কি আপনি
নগরে ফিরে যাবেন ?

—আজ নগরে ফিরে যাবার ইচ্ছা নেই...

এই ব'লে দুষ্প্রসূ জোর ক'রে নিজেকে স্থানচুত করেন...

অনসূয়া প্রিয়স্তুতি দেখে, গাছের ডালে-জড়িয়ে-যাওয়া বক্ল
খোলার ছলে শকুন্তলা দুষ্প্রসূর চলে-যাওয়ার দিকে চেয়ে আছে...
বক্ল মোচন করতে আজ শকুন্তলার চোখে জল ভ'রে আসে...

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠୀ

ଏ ଶୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚାଥ-ଅଳାପ

ତୁମ୍ଭନ୍ତ ନଗରେ ଫିରତେ ପାରେନନି...

ବିରାଟି ବାହିନୀ ନିୟେ ମୃଗ୍ୟାୟ ବେରିଯେଛିଲେନ... ସଙ୍ଗେ ସୈନ୍ୟ-ସାମନ୍ତ,
ସେନାପତି, ବିଦୂଷକ, ଏମନ କି ଶକ୍ତିଶାଲିନୀ ବିଧର୍ମୀ ଦ୍ଵାର-ରକ୍ଷଣୀ !

ମୃଗ୍ୟା ଏକଟ୍ୟ ଉଂସବ... ବିଶେଷ କ'ରେ ରାଜାର ସଙ୍ଗେ ମୃଗ୍ୟା...

ଦେଇ ଉଂସବ ସବେମାତ୍ର ସୁରୁ ହେଁଲେ, ତୁମ୍ଭନ୍ତ କି କ'ରେ ଆଦେଶ ଦେନ,
ତୁମୁ ତୁଲେ ତୋମରା ନଗରେ ଫିରେ ଯାଓ !

କେମନ କ'ରେ ତାଦେର ବଲେନ, ଆମି ଏଥିନ ଏକଲା ଥାକତେ ଚାଇ !

ତପୋବନ ଥିକେ ଦୂରେ ଅରଣ୍ୟେର ମଧ୍ୟେ ତୁମୁ ଶହର ଗପ୍ତେ ଉଠେଛେ...
ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାଦଯେର ଆଗେଇ ଶିଙ୍ଗା ବେଜେ ଓଠେ... ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମୁତେ
ସାଜ-ସାଜ ରବ ପଢ୍ଟେ ଯାଯା... ଶିକାରେର ଜଣେ ସବାଇ ପ୍ରକ୍ଷତ ହୁଏ...
ସୂର୍ଯ୍ୟାଦଯେର ଆଗେଇ ଶିଶିର-ସିନ୍ତ ପଥେ ଛୁଟିତେ ହବେ...

ତୁମ୍ଭନ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷତ ହୁନ...

ସକଳେର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭାତ ନା ହତେଇ ଧର୍ମବୀଣ ପିଠେ ଅରଣ୍ୟ-ପଥେ
ଏଗିଯେ ଚଲେନ...

ସାମନେ ଦିଯେ କୃଷ୍ଣସାର ହରିଣ ଆୟତଚକ୍ଷୁ ମେଲେ ଚଲେ ଯାଯା...
ତୁମ୍ଭକେ ତୌର ବସାତେ ପାରେନ ନା... ହରିଣେର ଦିକେ ଚେଯେ ମନେ
ପଢ୍ଟେ ଯାଯା ହରିଣ-ନୟନାକେ—ଏମନି ଆୟତ ତୌର ଛାଟି ଚୋଥ... ଚୋଥେର
ଦୃଷ୍ଟିତେ ଅରଣ୍ୟେର ସଞ୍ଜୀବନୀ ସବୁଜ ସ୍ନିଙ୍ଗତା... ସାରା ଦେହେ ଏମନି ବିଦ୍ୟତେର
ଚକିତ ଭଙ୍ଗୀ...

ପାଶେ ଥିକେ ବିଦୂଷକ ମାଧ୍ୟ ନୀରବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ଉତ୍ତତ ଧରୁକେର
ସାମନେ ଦିଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଚଲେ ଗେଲ ମୃଗ !

ମାଥାର ଓପରେ ମୁକୁଲିତ ଶାଲ-କିଂଣୁକେ ଉଡ଼େ ଏସେ ବସେ ବନ-
ବିହଙ୍ଗମେର ଦଲ... କଳ-କାକଲିତେ ଭ'ରେ ଯାଯା ଅରଣ୍ୟ...

পঞ্চকন্ত্র।

মাধব্য সত্ত্বে নয়নে গাছের দিকে চায়, এখনি পাকা ফলের
মতন বাণ-বিন্দু পাখীরা মাটিতে পড়বে...বড় সুস্থান এই বন-
বিহঙ্গমের মাংস...

কিন্তু আজ তুম্ভন্ত গাছের দিকে চেয়ে পাখীদের দেখতে পান
না, ডালে ডালে সবুজ পাতায় আর রাঙা ফুলে বসন্তের ঘোবন-
শোভা...শকুন্তলার অঙ্গের বাসন্তী-বিলাস...

বাঁক বেঁধে উড়ে যায় পাখীর দল—ডানার ঝাপটে ব'রে পড়ে
ফুটন্ত ফুলের পরাগ...সুরভিত হয়ে ওঠে অরণ্যবায়ু...

সুরভিত হয়ে ওঠে অরণ্যবায়ু শকুন্তলার দেহ-গন্ধে ..

বিশ্বয়ে চেয়ে থাকে মাধব্য, মাংস থেকে তাকে বঞ্চিত ক'রে
উড়ে গেল বন-বিহঙ্গমের দল ! ততোধিক বিশ্বয়ে চেয়ে দেখে
তুম্ভন্তকে...

অরণ্য মথিত ক'রে জেগে ওঠে বন্য-মহিয়ের চীৎকার...অভ্যাস-
বশত ধূকে তৌর ঘোজনা ক'রে তুম্ভন্ত এগিয়ে চলেন...

মাধব্য চীৎকার ক'রে ওঠে, ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন সখা ?
ওদিকে যে তপোবন...আপনিই নিবেধ করেছেন ওদিকে যেতে...

তুম্ভন্ত লজ্জিত হয়ে ফিরে আসেন...

মাধব্য গন্তীরভাবে বলে, অরণ্যে কি আপনার দিক্ব্লাস্তি হলো ?

তুম্ভন্তের মনে পড়ে তিনি রাজ-আজ্ঞা জারী করেছেন, কেউ যেন
তপোবনের সীমানায় পর্যন্ত না যায় !

নিজের আদেশে নিজে বাঁধা প'ড়ে গিয়েছেন—সেই সে প্রথম
দেখার পর, মৃগয়া উপলক্ষ্য ক'রে তিনি অরণ্যেই প'ড়ে আছেন;
কিন্তু একদিনের জন্যেও আর তপোবনে যেতে পারেননি ! কোথায়
মৃগ, কোথায় মৃগয়া—মন প'ড়ে আছে সেই বরা-বন্ধলের-জলে-
আঁকা আশ্রম-পথের দিকে চেয়ে...এত কাছে অথচ এত দূরে !

শকুন্তলার নীরব নত দৃষ্টিতে তিনি স্পষ্ট দেখেছেন নিম্নরের
বাণী...কিন্তু আজ তিনি জানেন, আশ্রম ও শকুন্তলা ছই-ই
অভিভাবকহীন...আশ্রমবাসীদের কাছেও তাঁর পরিচয় অগোচর
নয়...নিদ্রাহীন সারারাত ভেবে পথ পান না কোন্ অছিলায়
তপোবনে ঘাবেন !

মৃগহীন মৃগয়া শেষ ক'রে আবার অপরাহ্নে ঝান্ডদেহে তাঁবুতে
ফেরেন...

আবার রাত্রি আসে...

কত দূরে শকুন্তলা ?

প্রভাতে আবার সেই মৃগয়ার সাজসজ্জা ।

মাধব্য আজ বেঁকে বসে...

—আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু !

—কি ব্যাপার মাধব্য ?

বিদ্যুক হাতের লাঠিটা ছুঁটের সামনে তুলে ধরে, দেখেছেন
প্রভু, আমার এই লাঠিটি আট জায়গায় বাঁকা, তাই এর নাম
দিয়েছি অষ্টাবক্র । আপনার অনুগ্রহে এই ক'দিনেই আমার দেহ-
যষ্টি ও অষ্টাবক্র হয়ে গিয়েছে...মৃগহীন মৃগয়ায় আর ছুটাছুটি
করতে পারি না ! মাফ করুন আমাকে ! আজ আমি একটু
বিশ্রাম করি !

মৃগয়ায় ছুঁটেরও মন নেই...

তাই খুশী হয়েই বলেন, বেশ, তাই হোক, আজ শুধু তুমি
কেন, সবাই আজ বিশ্রাম করুক ! আজ কৃষ্ণসার মৃগ নির্ভয়ে
মৃগীকে ! অনুসরণ ক'রে খেলা করুক, নির্ভাবনায় আজ বন্ধ-মহিষের



পঞ্চকন্যা

দল পক্ষবিহার করুক, বৃক্ষান্তরালে নিশ্চিতে আজ পক্ষী-মিথুন করুক
চতুর্থ-চতুর্থ !

—আর আপনি নিরক্ষুশিতে শয়ায় শুয়ে বস্তি আশ্রম-
বালিকাদের রূপ-ধ্যান করুন !

আশ্রম-বালিকাদের কথা গুরুতে দুঃস্থ উল্লিখিত হ'য়ে গুরুতে,
তুমি বস্তি বলছো বয়স্ত, শকুন্তলার রূপ যদি তুমি দেখতে !

মাধব্য হেসে বলে, রাজ-অন্তঃপুরে রূপের অভাব ?

দূরের দিকে চেয়ে দুঃস্থ বলেন, তুনি জানো না তাই বলছো ।
এই রূপ-সৃষ্টির জন্যে স্বর্গ আর মর্ত্যকে চক্রান্ত করতে হয়েছে...
বিশ্বামিত্রের মতন ঋষির তপস্তার বীর্য আর অপ্সরী মেনকার রূপ-
বহু থেকে জন্মেছে এই বিদ্যুৎ-লতা...দেখ অবধি...

—বুঝেছি, অগ্নিকাণ্ড চলেছে মনে । মৃগয়া করতে এসে
নিজেই মৃগ হয়ে গিয়েছেন !

—রহস্য নয় মাধব্য ! বলতে পারো, কি উপলক্ষ্য আশ্রমে
আবার যাওয়া যায় ?

—রাজার আবার উপলক্ষ্য দরকার হয় নাকি ?

—রাজার অধিকারে আশ্রমে যেতে চাই না মাধব্য !

এমন সময় তাঁবুর বাইরে তপস্তীদের কর্তৃস্বর শোনা যায় !
দুঃস্থ সচকিত হয়ে গুরুতে...

দ্বারী এসে জানায়, তপোবন থেকে দুজন তপস্তী রাজ-দর্শনে
এসেছেন !

—নিয়ে এসো তাঁদের !

বিদূষক হেসে বলে, বোধহয় কোনো গোপন সংবাদ আছে...
আমি যাই ।

—না, তুমি যাবে না...তোমার কাছে আমার গোপন কিছু নেই।

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠ

ରାଜ-ବନ୍ଦନା କ'ରେ ଛଜନ ତପସ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେନ...

—ମହାରାଜ, ବିପନ୍ନ ହୟେ ଆପନାର କାହେ ଏମେହି ।

—କି ବିପଦ, ତପସ୍ତି ?

—ମହାରାଜ କଥ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଜେନେ ରାକ୍ଷସେରା ଆଶ୍ରମେ ଏସେ ଉଂପାତ କରଛେ...ଆପନି ସଶରୀରେ ଏଖାନେ ଉପସ୍ଥିତ ତାଇ ତପୋବନବାସୀଦେର ଅନୁରୋଧ, ଆପନି ଯଦି ଦିନକତକ ତପୋବନେ ଏସେ ବାସ କରେନ !

ବିଦୂଷକ ହେସେ ଓଠେ, ବିଧାତା ସୁପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଭୁ !

ଦୁଃଖ ବିଚଲିତ ହୟେ ଓଠେନ, ବିଦୂଷକ ବୁଝି ତପସ୍ତିଦେର ସାମନେଇ ଯା-ତା ବ'ଳେ ବସେ !

କିନ୍ତୁ ତପସ୍ତିରା ବିଦୂଷକେର କଥାର ତାଂପର୍ୟ ନା ବୁଝେ ବିଦୂଷକକେ ସମର୍ଥନ କ'ରେ ବଲେନ, ବିଧାତା ସୁପ୍ରସନ୍ନ ନା ହ'ଲେ ସ୍ଵୟଂ ରାଜ୍ଞୀ ଏ-ସମୟ ତପୋବନେର ସୀମାନ୍ତେ ଏସେ କେନ ବସବାସ କରବେନ !

ବିଦୂଷକ କିଛୁ ବଲବାର ଆଗେଇ ଦୁଃଖ ବଲେନ, ଆପନାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଫିରେ ଯାନ...ତପୋବନ ରଙ୍ଗା ଆମାର ଧର୍ମ...ଆମି ଏଖାନି ଯାବାର ବନ୍ଦୋବନ୍ତ କରାଛି !

ଦୁଃଖକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ରେ ତପସ୍ତିରା ଫିରେ ଯାନ...

ଦୁଃଖକେ କାହେ ଏଗିଯେ ଗିଯେ ମାଧ୍ୟ ଚାପାଗଲାୟ ବଲେ, ତାହ'ଲେ ତପୋବନ ଏବାର ଉପବନ ହବେ !

—ତୁମି ଭୁଲ ବୁବାହୋ ମାଧ୍ୟ ! ଦୁଃଖ ତିରକ୍ଷାର କ'ରେ ଓଠେନ ।

ଏମନ ସମୟ ଦ୍ୱାରୀ ଏସେ ଆବାର ଜାନାୟ, ରାଜପ୍ରାସାଦ ଥେକେ ମହାଦେବୀର ଦୂତ ଏସେହେନ !

—ଶିଗଗିର ନିଯେ ଏସୋ !

ଦୁଃଖକେ ବୁକ କେପେ ଓଠେ, ରାଜ-ଜନନୀ ଏ ସମୟେ ଦୂତ ପାଠାଲେନ କେନ ?

ଅଭିବାଦନ ଜାନିଯେ ଦୂତ ବଲେ, ରାଜ-ଜନନୀ ବ'ଳେ ପାଠିଯେଛେନ,

পঞ্চকন্যা

আগামী চতুর্থ দিবসে তাঁর উপবাস-ব্রতের পারণ হবে...সেই
উপলক্ষ্যে আপনাকে এখনি প্রাসাদে ফিরে যেতে হবে।

হৃষ্ণন্তের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে! একই সময় হ'দিকে
যাওয়া তো সন্ধিব নয়!

বিপন্ন হৃষ্ণন্ত বিদ্যুক্তের দিকে আর্ত-দৃষ্টিতে চান...

—আমি এখন কি করি মাধব্য! আমি যে তপস্বীদের কথা
দিলাম...তাছাড়া যখন শুনলাম আশ্রমের শাস্তি বিপন্ন, তখন
প্রাসাদে ফিরে যাই কি ক'রে?

মাধব্য হেসে বলে, তাছাড়া আশ্রমে গেলে...

—রহস্য নয় মাধব্য! এ বিপদ থেকে একমাত্র তুমিই
আমাকে উদ্বার করতে পারো...জননী তোমাকে পুত্রের মতনই
দেখেন...তুমি প্রাসাদে ফিরে গিয়ে আমার স্থান পূরণ করো...

মাধব্যের অরণ্যবাস তিক্ত হয়ে উঠেছিল, তাই এ স্মরণ
প্রত্যাখ্যান করতে মন চাইলো না...

—কিন্তু সখা, আমি মহাদেবীর পুত্ররূপে প্রাসাদে ফিরে যেতে
পারি, তবে রাজকুমারের উপযুক্ত সম্মান আমার চাই...

হৃষ্ণন্ত এই স্মরণেই খুঁজছিলেন...

—তুমি আশ্঵স্ত থাকো বন্ধু, আমি যেভাবে প্রাসাদে ফিরতাম,
তুমও সেইভাবে প্রাসাদে ফিরবে...সমস্ত লোক-জন সৈন্য-সামন্ত
সঙ্গে নিয়েই তুমি নগরীতে প্রবেশ করবে!

দৃত সেই সংবাদ নিয়ে নগরীতে ফিরে যায়...রাজাৰ আদেশে
সৈন্যৱা তাঁৰ তুলতে আরম্ভ করে...হৃষ্ণন্ত আশ্রমে যাবাৰ জন্যে
প্রস্তুত হন...

হঠাৎ হৃষ্ণন্তের মনে পড়ে, বিদ্যুক্ত যদি প্রাসাদে গিয়ে
শকুন্তলার গল্প করে!

পঞ্চকন্তা।

তাই নিভৃতে মাধব্যকে ডেকে দুঃস্থি বলেন, একটা কথা
তোমাকে বলি, ভুলো না, শকুন্তলা সন্ধে যা-কিছু প্রলাপ
তোমার কাছে বকেছি, তা নিছক প্রলাপই...এক মুহূর্তের জন্যে
মনে করো না যে তার মধ্যে কোনো সত্যতা আছে! সময়
কাটাবার জন্যে কল্পনা-বিলাস!

মাধব্য ঘাড় নেড়ে বলে, আপনার অতিশয়-উত্তি থেকেই
আমি তা বুঝেছিলাম!

নিশ্চিন্ত মনে দুঃস্থি একাকী তপোবনের দিকে এগিয়ে চলেন...

চতুর্বাক-বধু...তরা করো, এখনি নামবে রাণি

সংগ্রহ ক'রে প্রিয়মন্দা দ্রুত আশ্রমের দিকে চলেছেন...

পথে কথ-শিয়ের সঙ্গে দেখা...

—কি ব্যাপার প্রিয়মন্দা? পদ্মপাতা? মণ্ডল? উশীর মূল?

—সঁৰী শকুন্তলা উত্তাপে বড় কষ্ট পাচ্ছে, তাই উশীর-
প্রলেপের জন্যে পদ্মপাতা নিয়ে যাচ্ছি!

—তাহ'লে তো আর্যা গৌতমীকে খবর দিতে হয়! আমি
এখনি ঠাকে বলছি, শকুন্তলার জন্যে শান্তি-জলের ব্যবস্থা করতে!

তু'জন দু-দিকে চলে যায়...

যে-উত্তাপে শকুন্তলার অঙ্গ জলে যায়, সেই উত্তাপে দুঃস্থি
অধীর হয়ে তপোবনে ঘুরে বেড়ান!

তপোবনে এসে ধূলকে টক্ষার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাঙ্কসরা
অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, তপোবনবাসীরা আনন্দে আবার যজ্ঞ-কার্য
করছেন...কিন্তু আনন্দ কোথায় দুঃস্থির মনে?

পঞ্চকন্যা

কোথায় শকুন্তলা ? বাতাসে তার দেহ-স্ফুরভি আসে অথচ
নয়নে তাকে দেখা যায় না !

কোনোরকমে একবারও কি তাকে দেখা যায় না !

একথা তিনি কাকে বলবেন, তিনি তপোবনকে রক্ষা করতে
আসেননি, তিনি এসেছেন গোপন-অনলের দাহ থেকে নিজেকে
রক্ষা করবার জন্যে ?

হায় শকুন্তলা, তুমি কেন তপোবন-পালিতা হ'লে ? সমাগরা
বসুন্ধরাকে শাসন করতে পারি, কিন্তু তপোবনের একটা লতাকেও
উন্মূলন করতে পারি না ।

রাজাৰ সমস্ত শক্তি নিয়ে আমি ছুশ্যন্ত অসহায় ঘুরে বেড়াচ্ছি,
আমাৰ শক্তি নেই, কাউকে জিজ্ঞাসা করি, শকুন্তলা কেমন
আছে ! কোথায় আছে ?

যদি একটিবার শুধু জানতে পারতাম, যে-দাহে আমি জলছি,
সে দাহ কি তাকে স্পর্শণ করেনি ?

উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন বনপথে উদ্ভ্রান্ত ছুশ্যন্ত ঘুরে বেড়ান, যদি
কোনোরকমে প্রিয়স্বদা বা অনসুন্ধার সঙ্গেও দেখা হয়ে যায় !

সহসা বনেৰ আড়াল থেকে চোখে পড়ে, অদূৰে মালিনী
সূর্য্যকৰে ঝিকমিক কৰছে...

মালিনীৰ দিক থেকে স্নিখ বায়ু আসে, আমন্ত্ৰণেৰ মত...

—মালিনী, আজ তুমি আমাৰ মৰ্মসংগী হও—তোমাৰ তীৱেৰ
স্নিখ ছায়া-তকুৱ তলায় আজ রাজা ছুশ্যন্ত...

সহসা ভ্ৰমৰ-গুঞ্জনেৰ মত কানে আসে নারী-কষ্ট !

বাতাসে কান রেখে ছুশ্যন্ত কম্পিতপদে এগিয়ে চলেন...

কিছুদূৰ গিয়ে আৱ যেতে পাৰেন না ... মালিনীৰ তীৱেৰ বেতস-
কুঞ্জে বিগলিত-বক্ষ-বক্ষলা শকুন্তলা নিশ্চল মৰ্মৱ-মূর্ণিৰ মত ব'সে

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠ

...ରୌଜ୍ରତାପେ ପଦ୍ମପାତା ଶୁକିଯେ ସ୍ତନ୍ୟଗଳ ଥେକେ ପ'ଡ଼େ ଗିଯେଛେ...
ଓଲେପେର ଗଙ୍କେ ମୁଖ ଭର ବିକାଶୋନୁଥ ପଦ୍ମକଲି-ବିବେଚନାୟ ବାରବାର
ସନାଗଲୋଭୀ ହୟେ ଛୁଟେ ଆସଛେ...ଅନ୍ୟଯା ମୃଗାଲଦଣ୍ଡ ନିଯେ ବାରବାର
ମଧୁଲୋଭୀକେ ତାଡ଼ନା କରଛେ...ପ୍ରିୟମ୍ବଦ୍ଧା ନତୁନ ପଦ୍ମପାତା ଓଲେପେ
ସିଙ୍ଗ କରଛେ...

ଦୁଷ୍ମନ୍ତେର ଅନ୍ତର ବ'ଲେ ଓଠେ, ଅଯେ ଲକ୍ଷଂ ନେତ୍ରନିର୍ବାଣମ୍ ! ଏହି ତୋ
ପେଲାମ ନୟନ-କୁଢ଼ାର ପରମ ମୁଧା !

ମାଟିତେ-ଲଗ୍ନଦୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନ ଶୁକମୁଥ ଶକୁନ୍ତଲା କାର କଥା ଭାବଛେ ?

ହାୟ ଲୋଭୀ ମନ ! ହାୟ ଭୀର ମନ !

ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ଗାଛେର ଆଡ଼ାଲେ ଦାଁଡ଼ିଯେ କାନ ପେତେ ଶୋନେନ...

ଚନ୍ଦନବାରିତେ ପଦ୍ମପାତା ଭିଜିଯେ ଦୁଇ ସଖୀରେ ସୀରେ ବାତାସ କରେ...

—ପଦ୍ମପାତାର ହାୟଯା ଭାଲୋ ଲାଗଛେ ତୋ ସଥି ?

ପଦ୍ମକୋରକେର ମତନ ଦୁଇ ଚୋଥ ତୁଲେ ଶକୁନ୍ତଲା ସଖୀଦେର ଦିକେ
ଚେଯେ ବଲେ, ଥାକ୍ର ସଥି ପଦ୍ମପାତାର ବାତାସ !

ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାବେନ, ଏ ଗ୍ରୀମେର ଦାହ, ନା ମଦନେର ଦାବାଗ୍ନି ?

ଅନ୍ୟଯାର ଦିକେ ଚେଯେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ ଫେଲେ ବଲେ, ଯେଦିନ
ଥେକେ ରାଜାକେ ସଥି ଦେଖେଛେ, ମେଇଦିନ ଥେକେ ଏହି ଦଶା !

ଅନ୍ୟଯା ଶକୁନ୍ତଲାର ଝାନ୍ଦାଦେହ ନିଜେର ଦେହର ଓପର ଟେନେ ନିଯେ
ବଲେ, ସଥି, ଅମନ କ'ରେ ନୀରବେ ଶୁକିଯେ ମରିସ୍ ନା, ଆମାଦେର ବଳ,
କିସେର ଜଣେ ତୋର ଏହି ସନ୍ତାପ ?

ଶକୁନ୍ତଲାର କର୍ତ୍ତ ଅଞ୍ଚତେ ଭିଜେ ଆସେ...

—ଆମି କି ଉତ୍ତର ଦେବୋ ସଥି ! ଯା ଅସଙ୍ଗତ ତା କି କ'ରେ
ଉଚ୍ଚାରଣ କରବେ ?

—କିସେ ଅସଙ୍ଗତ ? ତାତ କଥ ତୋ ତୋର ଜଣେ ଉପ୍ୟକ୍ତ ପାତ୍ରେର
ସନ୍ଧାନ କରଛେ...ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତେର ମତ ଉପ୍ୟକ୍ତ ପାତ୍ର କେ ହତେ ପାରେ ?

পঞ্চকন্যা

—কিন্তু...

অঙ্গসজল করণ দৃষ্টিতে শকুন্তলা অনসূয়ার দিকে চেয়ে
থাকে...কোনো কথা বলতে পারে না...অকথিত কথা অঙ্গবিন্দু
হয়ে ঝ'রে পড়ে !

নিমেষে অনসূয়া বুবাতে পারে শকুন্তলা কি কথা বলতে চাইছে
অথচ বলতে পারছে না !

শকুন্তলাকে সাম্ভনা দিয়ে বলে, সখি, আমার চোখ ভুল
ঢাখেনি...আমি দেখেছি, রাজা দুষ্মন্তও তোকে দেখে নিমেষে
অন্তরে বরণ ক'রে নিয়েছেন...

অনুচ্ছারিত-কঠে গাছের আড়াল থেকে দুষ্মন্ত বলেন, অনসূয়া,
তুমি আমারও প্রিয়সখি !

সহসা প্রিয়সন্দা উচ্চকিত হয়ে ওঠে, শকুন্তলার হাত ধ'রে বলে,
এক কাজ করলে হয় না সখি ? রাজা তো তপোবনেই রয়েছেন...
রাজাকে সঙ্ঘোধন ক'রে তুই এক গ্রণয়-পত্রিকা লেখ...দেবতার
প্রসাদের ছল ক'রে প্রসাদী-ফুলের ভেতর লুকিয়ে সে-চিঠি রাজার
হাতে দেবো ! কি বলিস্ ?

শকুন্তলার ম্লান অধরে কি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে ?

সলজ্জকঠে শকুন্তলা বলে, আমি কি বলবো ! শকুন্তলা কি
কোনোদিন তার প্রিয়সখির অবাধ্য হয়েছে ?

অধীর হয়ো না দুষ্মন্ত ! যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, সেইখানেই
দাঁড়িয়ে থাকো ! এ মুহূর্ত জীবনে কে পায় ?

লজ্জিতকঠে শকুন্তলা বলে, কিন্তু কিসে লিখবো ?

একটা সবুজ পদ্মপাতা প্রিয়সন্দা শকুন্তলার সামনে রেখে বলে,
শুকপাখার গলার তলার মতন নরম এই সবুজ পদ্মপাতা, একটু

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠ

ନଥେର ଭାର ପଡ଼ିଲେଇ ରେଖା ଫୁଟେ ଉଠିବେ...ନିଜେର ଆଙ୍ଗୁଲେର ନଥ ଦିଯେ ଏହି ସବୁଜ ପଦ୍ମପାତାୟ ପତ୍ର ଲେଖ୍ !

ଶକୁନ୍ତଳା ଏକବାର ପଦ୍ମପାତାର ଦିକେ ଚାଯ, ଆବାର ନିଜେର ନଥେର ଦିକେ ଦେଖେ, ଭେବେ ପାଯ ନା କି ଲିଖିବେ, କି ବ'ଳେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ...

ସବୁଜ ପଦ୍ମପାତାୟ ଫୁଟେ ଓଠେ ନଥେର ରେଖା...

—ତୁଜ୍ବା ନା ଆନେ ହିଅଅଂ...ତୋମାର ହଦୟ ଆମି ଜାନି ନା...
ମହ ଉଣ...ଆମାର କିନ୍ତୁ...

ନୟନ-ପଦ୍ମ ଥିକେ ପଦ୍ମପାତାୟ ଗଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ ଛଟି ମୁକ୍ତା-ବିନ୍ଦୁ...

ଅନ୍ତରାଳ ଥିକେ ଦୁଇନ୍ତ ସାମନେ ଏସେ ଦାଁଡାନ !

ଶିଥିଲ-ବକ୍ଳଳ କୋନୋରକମେ ସାମଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ଚମକେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାର ଦିକେ ଚାଯ !

ହେସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟା ବଲେ, କି ଆଶର୍ଯ୍ୟ ! ଠିକ ଯେ-ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଦରକାର, ଏକେବାରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଏସେ ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀ ହେୟେଛେନ ! ବସୁନ...ଏହି ପାଥରେର ଓପର...ଏହି ହୋକ୍ ରାଜ-ସିଂହାସନ !

ଶକୁନ୍ତଳା ପାଥରେର ଆସନ ଥିକେ ଉଠେ ଦାଁଡାନ !

—ନା, ନା, ତୁମି ଉଠୋ ନା ! ତୋମାକେ ସ୍ଥାନଚୁଯତ କ'ରେ ଆମି ବସତେ ଚାଇ ନା !

ଶକୁନ୍ତଳା କରଣ ନୟନେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାର ଦିକେ ଚାଯ !

ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟା ବଲେ, ତାହ'ଲେ ଏକ କାଜ କରନ, ଆପଣି ଶିଲାଖଣ୍ଡେ ବ'ସେ ଶକୁନ୍ତଳାକେ ପାଶେ ବସବାର ଅଧିକାର ଦିନ !

—ସେ-ଅଧିକାର ତୋ ଚାଇବାର ଦରକାର ନେଇ ସଥି !...

ଦୁଇନ୍ତ ଶିଲାସନେ ବସେନ...

କିନ୍ତୁ ଶକୁନ୍ତଳା ବସତେ ପାରେ ନା...

ସାରା ଅଙ୍ଗ ତାର କେଂପେ ଓଠେ...

ପ୍ରିୟନ୍ଦୀ ଏଗିଯେ ଏସେ ବଲେ, ଆପଣାଦେର ତଜନକେଇ ଯେ-ଅବସ୍ଥା

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠ

ଦେଖଛି, ତାତେ ଆର ଭୂମିକାର କୋନୋ ଦରକାର ନେଇ...କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର
ଦୁ'ଏକଟା କଥା ଜାନବାର ଆଛେ !

—ବଲୋ ସଥି !

ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରିୟମ୍ବଦୀକେ ବାଧା ଦେଇ, ମୃଦୁକର୍ତ୍ତେ କାନେ-କାନେ ବଲେ,
ରାଜ-ମହିଷୀଦେର ବିରହେ ରାଜୀ ଏଥିନ କ୍ଳାନ୍ତ ତ୍ରିଯମାନ...ଏଥିନ ତାଙ୍କେ
ଉତ୍ସକ୍ତ କରା କି ଠିକ ହବେ ?

ଶକୁନ୍ତଳାର କଥାର ଆଡ଼ାଲେ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିତ ଦୁଆନ୍ତ ବୁଝାତେ ପାରେନ... .

ଶକୁନ୍ତଳାକେ ସମ୍ମୋଦନ କରେଇ ବଲେନ, ହାଯ ଶକୁନ୍ତଳା ! ମଦନେର
ଆସାତେ ହତପ୍ରାୟ ହେଇ ଛିଲାମ, ଏବାର ତୋମାର ମୃଦୁ ବଚନେର ଆସାତେ
ମରତେଇ ହୟ ! ଶକୁନ୍ତଳା-ଦର୍ଶନେର ପର ଏ-ହଦୟେ ଅନ୍ୟ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଆଛେ,
ଏ-କଥା ଯଦି ତୁମି ଭେବେ ଥାକୋ, ତାହ'ଲେ ଦୁଇନ୍ତରେ ମରଣଇ ଭାଲୋ !

ଅନୁମ୍ଭ୍ୟା ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ସଂଶୋଧନ କ'ରେ ନେଇ,—

—ଭୁଲ ବୁଝବେନ ନା ସଥି ! ଆମାଦେର ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟା ମିନତି, ଶୁନେଛି
ରାଜାଦେର ବହୁ ମହିଷୀ ଥାକେନ, ସେଥାନେ ଶକୁନ୍ତଳା ଯେନ କୋନୋ ଶୋକ
ବା ବ୍ୟଥା ନା ପାନ !

—ତାହ'ଲେ ଶୋନୋ ଅନୁମ୍ଭ୍ୟା, ଦୁଇନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେର କଥା । ଦୁଇନ୍ତରେ
ଅନ୍ତଃପୁରେ ବହୁ ନାରୀ ଥାକୁକ, ଦୁଇନ୍ତରେ ରାଜଭାଣ୍ଡରେ ବହୁ ରଙ୍ଗଇ ଥାକୁକ,
ଦୁଇନ୍ତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚିଯ ଛଟି ଜିନିମେ, ସମୁଦ୍ର-ବସନା ଚୋରବୀ ଚ
ୟୁବ୍ୟୋବିଯମ, ସମୁଦ୍ର-ବସନା ପୃଥିବୀ ଆର ଏଇ ତୋମାଦେର ପ୍ରିୟସଥୀ
ଶକୁନ୍ତଳା !

—ଆର କିଛୁ ଶୁନତେ ଚାଇ ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଲାମ ଆମରା ।

ହଠାତ୍ ପ୍ରିୟମ୍ବଦୀ ଅନୁମ୍ଭ୍ୟାର ହାତ ଧ'ରେ ଟାଲେ, ଏଇ ଢାଖ୍ ଅନୁମ୍ଭ୍ୟା,
ହରିଗ-ଶିଶୁଟା ତାର ମାକେ ଖୁଁଜେ ନା ପେଯେ ଛୁଟୋଛୁଟି କରଛେ...ଚଲ,
ଓକେ ଓର ମାର କାହେ ଦିଯେ ଆସି...ଆୟ... .

ଏଇ ବ'ଲେ ଅନୁମ୍ଭ୍ୟାର ହାତ ଧ'ରେ ଟେନେ ନିଯେ ଯାଯ !

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠ

ଶକୁନ୍ତଳା ଅଭିମାନେ ବ'ଲେ ଓଠେ, ତାରି ଅନ୍ତାର...ଆମାକେ ଏଭାବେ
ନିରାଶ୍ରୟ ଫେଲେ ତୁଜନେଇ ତୋରା ଚଲେ ଗେଲି ?

ଆଡ଼ାଳ ଥେକେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାର କଞ୍ଚକ ଆସେ, ପୃଥିବୀର ଆଶ୍ରୟ ଯିନି,
ମେଇ ରାଜା ସଶରୀରେ ତୋର ସାମନେ ଦାଢ଼ିଯେ, ନିରାଶ୍ରୟ କୋଥାଯ ତୁହି ?

ତବୁ ଶକୁନ୍ତଳା ନତମୁଖେ ନବ-ମଲ୍ଲିକାର ଦିକେ ଚେଯେ ବଲେ, ଦେଖଲି,
ତୁଜନେଇ ଚଲେ ଗେଲ !

ଶକୁନ୍ତଳାର ଏକେବାରେ କାହେ ଗିଯେ ତୁମ୍ଭ ବଲେନ, ତାତେ କି
ହେଯେଛେ ? ଆମି ତୋ ଆଛି...ବଲୋ, କି କରତେ ହବେ ?

ଅନ୍ଧରୀର କଣ୍ଠା ଶକୁନ୍ତଳା ଏବାର ସାଡ଼ ତୁଲେ ଚାଯ, ସ୍ଥିରକଟେ ବଲେ,
ମାନୀ ଲୋକେର ସେବା କି କ'ରେ ନେବୋ ?

ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ସାବାର ଜଣେ ପା ବାଡ଼ାଯ...
ତୁମ୍ଭ ପଥରୋଧ କ'ରେ ଦାଢ଼ାନ...

—ଦିନେର ଆଲୋ ଏଥନୋ ଅଫୁରନ୍ତ ରଯେଛେ...ବାତାସେ ରଯେଛେ
ମୂର୍ଯ୍ୟେର ତାପ...ଏଥନୋ ଉଶୀର-ପ୍ରଲେପେ ଢାକା ତୋମାର ସ୍ତନ...ଏ ଛାଯା
ଛେଡ଼େ କେନ ଘାବେ ଏଥନ ?

ଦୀର୍ଘବାହୁ ଦିଯେ ତୁମ୍ଭ ବକ୍ଷେ ବୈଷନ କ'ରେ ନେନ ଶକୁନ୍ତଳାକେ !

ବାହୁତେ ବନ୍ଦୀ ଶକୁନ୍ତଳା ତେମନି ସ୍ଥିରକଟେ ବଲେ, ଆମି,
ଆପନାର କାହେ ଅବିନୟ ଦେଖାତେ ଚାଇ ନା, ଆମାର ହଦୟ ଆପନି
ଜାନେନ, ତବୁ ଆମି ନିଜେ ନିଜେକେ ଦିତେ ପାରି ନା, ଆମି ତୋ
ଆମାର ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ !

—ହାଯ ଭୀର, ଆମି ବୁଝାଇ ମହର୍ଷି କଥେର ଜଣେ ତୁମି ଭୀତ ହଚ୍ଛୋ !
କିନ୍ତୁ କେନ ? ଗାନ୍ଧର୍ବ-ବିବାହ ଝବିଦେର ଅନୁମୋଦିତ...ମହର୍ଷି କଥ ଯଥନ
ଏସେ ଶୁନବେନ ଗାନ୍ଧର୍ବ-ବିବାହେ ଆମି ତୋମାକେ ଶ୍ରୀରାପେ ପ୍ରହଣ କରେଛି,
ତିନି ନିଶ୍ଚଯିତା ଅମତ କରବେନ ନା !

ତୁମ୍ଭଙ୍କେ ମୁଖ ଥେକେ ଏଇ ବିବାହେର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଇ ଶକୁନ୍ତଳା ଶୁନତେ

পঞ্চকন্যা

চেয়েছিল ! তাই দুঃস্মিন্তের কথায় অন্তরের সব দ্বিধা দূর হয়ে যায়...

তবুও মুখে বলে, আমাকে ছেড়ে দিন ! সখীরা কি ভাবছে !

বঙ্কন আরো গাঢ় ক'রে দুঃস্মিন্ত বলেন, ছাড়বো, কিন্তু এখন নয়...

পুরুষের প্রশংসন বুকে মুখ লুকিয়ে নারী জিজ্ঞাসা করে, কখন ?

হাত দিয়ে শকুন্তলার মুখ তুলে ধ'রে দুঃস্মিন্ত বলেন, যতক্ষণ না তোমার ঐ অক্ষত অধরের স্মরণ আমার পিপাসা মিটছে...

অধীর দুঃস্মিন্ত অধর-পেষণের জন্যে নত হন...

এমন সময় নেপথ্যে অনস্ময়ার কষ্ট শোনা যায়,—

—চক্রবাক-বধু, তুরা করো—এখুনি নামবে রাত্রি ! *

শকুন্তলা সচকিত হয়ে ওঠে...অনস্ময়ার কথার পেছনে প্রচলন
ইঙ্গিত বুবতে পারে...দুঃস্মিন্তের বাহুবঙ্কন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে
বলে, নিশ্চয়ই আর্য্যা গৌতমী আমার জন্যে শান্তিজল নিয়ে
আসছেন, তাই অনস্ময়ার এই সতর্ক-বাণী !

অধরের দ্বার থেকে ফিরে আসে ত্রুটা !

শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ হয়...

বিব্রতকষ্টে শকুন্তলা বলে, দয়া ক'রে ঐ গাছের আড়ালে
আঘাতগোপন করুন !

দুঃস্মিন্ত অমান্য করতে পারেন না। শান্তিজল নিয়ে আর্য্যা
গৌতমী প্রবেশ করেন...

—সারাদিন বড় কষ্ট পেয়েছো...না মা ?

শকুন্তলা মুখে শান্তিজল দেন। জিজ্ঞাসা করেন, এখন কেমন
বোধ করছো ?

নতমুখে শকুন্তলা বলে, এখন একটু ভালো বোধ করছি।

* রাত্রি হলেই চক্রবাক আর চক্রবাকী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এই জনশক্তি।

পঞ্চকন্যা

সর্বাঙ্গে শান্তিজল ছিটিয়ে গৌতমী আশীর্বাদ করেন, দেহের
সর্ব-সন্তাপ দূর হোক !

আদরে শকুন্তলাকে পাশে টেনে নিয়ে গৌতমী বলেন, এখানে
একলাটি কি করবে ? সন্ধ্যা হয়ে আসছে, চলো আমার সঙ্গে
পর্ণশালায়...

কি ব'লে শকুন্তলা প্রতিবাদ করবে ?

হায় শকুন্তলা !

গাছের আড়াল থেকে দুষ্প্রত দেখেন, পেছনের দিকে চাইতে
চাইতে শকুন্তলা গৌতমীর সঙ্গে চলে গেল !

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে দুষ্প্রত দেখেন, শৃঙ্গ শিলাসন...
শিলাসনের তলায় পদ্মপাতায় লেখা শকুন্তলার অসমাপ্ত লিপি...
সঢ়ফোটা নব-মল্লিকার গঞ্জে শকুন্তলার দেহ-বাস...

সামনে নেমে আসে সন্ধ্যার ছায়া...

একটা মুহূর্তের অনবধানতার জন্যে

আজ শকুন্তলার সৌভাগ্য-দেবতার অর্চনা হবে...

তাই অনসূয়া আর প্রিয়ম্বদা বেশী ক'রে ফুল চয়ন করছে...

ফুল চয়ন করতে করতে অনসূয়া বলে, আমার খালি ভয়
হচ্ছে প্রিয়ম্বদা, মহর্ঘি কথ ফিরে এসে যখন শুনবেন, তাঁর
অনুপস্থিতিতে শকুন্তলার বিবাহ হয়ে গিয়েছে... তখন যদি...

—বৃথা তুই ভয় পাচ্ছিস অনসূয়া ! আশ্রমের সমস্ত ঝবির
সামনে এই গান্ধর্ব-বিবাহ সিদ্ধ হয়েছে... মহারাজ দুষ্প্রত আশ্রম-
বাসীর আশীর্বাদ নিয়েই রাজধানীতে ফিরেছেন... শকুন্তলা আজ
তাঁর পরিগীতা স্ত্রী ! এমন যোগ্য স্বামী আর কে হতে পারতো ?

পঞ্চকন্যা

—কিন্তু মহর্ষি কথের ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার মন শান্তি পাচ্ছে না... তিনি না ফিরে এলে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর ব্যবস্থাই বা কে করবে? দুশ্মন সেই যে চলে গিয়েছেন, আজও পর্যন্ত একটা খবর পাঠালেন না... সখি শকুন্তলার অবস্থা দেখেছিস? পটে-আঁকা ছবির মতন সবসময় স্থির হয়ে ব'সে আছে, ডাকলে শুনতে পায় না, কাছে গেলেও দেখতে পায় না...

প্রিয়মন্দা হেসে বলে, আমরা এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, কিন্তু আমি জানি, মহারাজ দুশ্মনের মতন লোকের প্রেম-শপথ কখনোই মিথ্যা হতে পারে না...

এমন সময় আশ্রমের দ্বারের দিক থেকে একটা গুরু-গন্তীর কঠ ভেসে আসে,

—অয়মহং ভোঁ। *

ফুল তুলতে তুলতে তারা কান পেতে শোনে...

প্রিয়মন্দা বলে, বোধহয় কোনো অতিথি এসেছেন! চল যাই!

—দাঢ়া, এই ফুলগুলো তুলে নি! শকুন্তলা তো রয়েছে!

প্রিয়মন্দা তাড়া করে,

—শকুন্তলাতো নামে মাত্র আছে... সে কি কিছু শুনতে পাচ্ছে?

ফুল তোলা শেষ না হতেই তাদের কানে আসে, তিক্ত ত্রুদ্ধকর্ণে অভিশাপ-বাণী!

—ওরে অতিথিপরিভাবিনি! যার ভাবনায় আঘাতার হয়ে তুই আমাকে অগ্রাহ করলি, আমার অভিশাপে, সে-ও তোকে অগ্রাহ করবে... চিনতে পর্যন্ত পারবে না!

অনন্যা-প্রিয়মন্দার হাত থেকে ফুলের সাজি প'ড়ে যায়... ছুটে আশ্রম-দ্বারের কাছে গিয়ে দেখে, কি সর্বনাশ! স্বয়ং দুর্বাসা!

* আমি এসেছি, কে আছো?

ଛୁଟେ ଗିଯେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦୀ ଅଗ୍ନିମୃତି ଝାଧିର ପଥରୋଧ କ'ରେ ମାଟିତେ
ଲୁଟିଯେ ପ୍ରଗାମ କରେ—ଏ କି କରଲେନ ଝାଧିବର ! ଏକଟା ମୁହଁରେ
ଅନବଧାନତାର ଜନ୍ମେ ଦଙ୍ଘ କ'ରେ ଗେଲେନ ଏକଟା ସମଗ୍ର ଜୀବନ ?
ଶକୁନ୍ତଳା ଆପନାର କଣ୍ଠା...ସତ୍ୟ-ପରିଜୀତା...ସ୍ଵାମୀ-ବିରହେ ବିମୂଳା...
କ୍ଷମା କରନ ତାକେ !

ଅବିଚଲିତ କଟେ ଝାଧି ଛର୍ବାସା ବଲେନ, ସେ-ପ୍ରେମେ ଏମନ ବିମୃତତା
ଆନେ, ସେ-ପ୍ରେମ ଅଭିଶାପ-ଯୋଗ୍ୟ !

—ହାୟ ଝାଧି ! ହାୟ ଝାଧି ! ଆର୍ତ୍ତନାଦ କ'ରେ ଓଠେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦୀ, ଯେନ
ଏ-ଅଭିଶାପ ତାକେଇ ଦଙ୍ଘ କରେଛେ,—କ୍ଷମା କରନ, କ୍ଷମା କରନ, ତାର
ଜୀବନେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ...ଅପରାଧହୀନା ସେ...ଏମନ ଶାନ୍ତି ତାକେ
ଦେବେନ ନା, ଯାର କୋନୋ ପ୍ରତିକାର ନେଇ ! ସାମାନ୍ୟ ଏକଟା ବନକୁଶ୍ମ,
ଆପନାର ତପଶ୍ଚାର ଆଣ୍ଟନେ ତାକେ ଦଙ୍ଘ କରବେନ ନା !

ତବୁ ଛର୍ବାସା ଫିରିଯେ ନିଲେନ ନା ତାର ଅଭିଶାପ-ବାଣୀ !...

—ଆମାର ଉଚ୍ଚାରିତ କଥାକେ ବ୍ୟର୍ଥ କରବାର ଅଧିକାର ଆମାରଓ
ନେଇ । ତବେ ଆମି ବଲତେ ପାରି, ସଦି କୋନୋ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଦେଖାତେ
ପାରେ, ପୂର୍ବ-ସମ୍ବନ୍ଧେର ସ୍ମରଣ ଫିରେ ଆସବେ !

—ତାଇ ହୋକ, ତାଇ ହୋକ ଝାଧିବର !—ସନ୍ତୁଷ୍ଟଚିତ୍ତେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦୀ ଉଠେ
ଦୀଢ଼ାଯା...

ଅମୋଘ ଭବିତବ୍ୟତାର ମତନ ଅକଞ୍ଚାଂ ଏକଟି ମୁହଁରେ ଆବିର୍ଭାବ
ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଟିଯେ ଛର୍ବାସା କ୍ଷାନ୍ତ-ପ୍ରଲୟ ଝାଡ଼େର ମତନ ଚଲେ ଯାନ...

ଅନୁମୂଳ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧ'ରେ ବଲେ, ଆର କୋନୋ ଭୟ
ନେଇ...ମନେ ଆଛେ ? ଯାବାର ସମୟ ଦୁଇନ୍ତରୁ ହଠାଂ କି ମନେ କ'ରେ
ନିଜେର ଆଙ୍ଗୁଲେର ଆଂଟି ଖୁଲେ ଶକୁନ୍ତଳାର ଆଙ୍ଗୁଲେ ପରିଯେ ଦିଯେ
ବଲେଛିଲେନ, ଏହି ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନଟୁକୁ ଥାକ୍ !...ଦୈବ ରକ୍ଷା କରେଛେନ, ସେଇ
ଆଂଟିଇ ହବେ ଅଭିଜ୍ଞାନ !

পঞ্চকন্যা

আশ্রমের দিকে হুজনে এগিয়ে চলে...

দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখে, প্রাঙ্গণের ওধারে নতমুখী শকুন্তলা
তেমনি নিশ্চল ব'সে আছে... তার জীবনের ওপর দিয়ে যে বাড়
ব'য়ে গেল তার কোনো খবরই সে জানে না !

অনসূয়া প্রিয়মন্দাকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বলে, প্রিয়মন্দা,
খাধি দুর্বাসার কথা শকুন্তলাকে জানাবার কোনো দরকার নেই...
শুনলে অকারণ দুর্ভাবনায় মরে যাবে !

প্রিয়মন্দা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে-কথা আর বলতে ! তরুণ
নব-মল্লিকায় তপ্তজল কে ঢালে ? চল... সব ফুল প'ড়ে গিয়েছে...

শকুন্তলার সৌভাগ্য-দেবতার অর্চনার জন্যে তারা আবার ফুল-
চয়নে চলে যায়।

অন্তরিহিতা সউন্তলা বনরাইঞ্জ

গত রাত্রিতে মহর্ষি কথ দূর তীর্থ থেকে আশ্রমে ফিরে
এসেছেন... আশ্রমে এসেই শকুন্তলার সংবাদ শুনেছেন...

সেই সঙ্গে শুনেছেন শকুন্তলা সন্তানবতী ! অথচ দুষ্টের কোনো
সংবাদ নেই !

শিয়া শার্ঙ্গরবকে ডেকে শুধু বললেন, কাল সূর্যোদয়ের আগেই
সুম থেকে উঠে এবং প্রাতঃকৃত্য মেরেই আমার সঙ্গে দেখা করবে !

প্রিয়মন্দা-অনসূয়া সেদিন নিদ্রাহীন উৎকর্ষায় জেগে রাত কাটায়...

শেষ-রাত্রিতে শয়া থেকে উঠে শার্ঙ্গরব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়...

মহর্ষি কুটীরের দিকে যেতে-যেতে রাত্রি-শেষের আকাশের
দিকে হঠাতে নজর পড়ে...

একই আকাশে একদিকে চন্দ্র অস্ত-শিখরের দিকে চলেছেন,

ପଞ୍ଚକଳ୍ୟ

ଆର ଏକଦିକେ ରକ୍ତ-କିରଣ-ରଥେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ-ଶିଖରେ ଦିକେ ଏଗିଯେ
ଆସଛେନ...

ଆଲୋଡ଼ିତ ହୟେ ଓଠେ ଶାଙ୍କରବେର ମନ...ପ୍ରତିଦିନ ତୋ ଏ-ଦୃଶ୍ୟ
ଆକାଶେ ଘଟଛେ, ଆଜ କେନ ତାଇ ଦେଖେ ମନ ବିଚଲିତ ହୟେ ଓଠେ ?

ମହିର କଥେର କୁଟୀରେ ଏସେ ଦାଁଡ଼ାତେଇ ଶାଙ୍କରବ ଦେଖେ—ସ୍ନାନାଟ୍ଟେ
ପଟ୍ଟବସ୍ତେ ମହିର ଦାଁଡ଼ିଯେ...

ଶାଙ୍କରବ ଏସେ ଦାଁଡ଼ାତେଇ ମହିର ବଲେନ, ଶାଙ୍କରବ, ଆଶ୍ରମବାସୀଦେର
ଜାନାଓ, ଆଜ ଶୁଭଦିନ, ଆଜ ଶକୁନ୍ତଳା ପତିଗୃହେ ଯାବେ...ପ୍ରିୟମଦ୍ଦା-
ଅନୟୁଯାକେ ବଲୋ, ଶକୁନ୍ତଳାକେ ଯେନ ସଯତ୍ନେ ନବବଧୂର ବେଶେ ସାଜିଯେ
ଦେଇ !

କୁଟୀରେ କୁଟୀରେ ବେଜେ ଓଠେ ମନ୍ଦଲଶଞ୍ଜ...

ଶକୁନ୍ତଳା ଆଜ ଯାବେ ପତିଗୃହେ...କୁଟୀରେ କୁଟୀରେ ଚଲେ ମାନ୍ଦଲିକ...
କେପେ ଓଠେ ଅନୟୁଯା-ପ୍ରିୟମଦ୍ଦାର ଅନ୍ତର...ଆଜଇ...ଏତ ଶିଗଗିର...
ଚଲେ ଯାବେ ଶକୁନ୍ତଳା !

ଅଞ୍ଚ-ବାପ୍ପେ ରନ୍ଦ ହୟେ ଆସେ କଷ...ଶକୁନ୍ତଳାହୀନ ଜୀବନ ତାଦେର
କି କ'ରେ କାଟିବେ ?

ଅନୟୁଯାକେ ଆଶ୍ଵାସ ଦେବାର ଛଲେ ପ୍ରିୟମଦ୍ଦା ନିଜେକେଇ ଆଶ୍ଵାସ
ଦେଇ, ଆମାଦେର କୋନୋ ଛଂଖ ନେଇ, ଶକୁନ୍ତଳା ତୋ ସୁଖେ ଥାକବେ !

ପାଛେ ମାନ୍ଦଲିକ-ଉପଚାରେ ଅଞ୍ଚ ପଡ଼େ, ଅନୟୁଯା ଜୋର କ'ରେ ହେସେ
ଓଠେ...

ସାରା ଅରଣ୍ୟର ଶୋଭା ଦିଯେ ଆଜ ପ୍ରିୟମଦ୍ଦା-ଅନୟୁଯା ଶକୁନ୍ତଳାକେ
ସାଜାଯାଇ...

କିନ୍ତୁ କେଉଁ-ଇ କୋନୋ କଥା ବଲତେ ପାରେ ନା !

পঞ্চকন্যা।

আর্য্যা গৌতমী এসে তাড়া দেন, শুভ-লগ্নের আর দেরী নেই,
বরা করো !

শকুন্তলার সেই পুষ্পময়ী নববধূর বেশ দেখে তৃপ্ত হয়ে গৌতমী
বলেন, এই তো হয়েছে...এসো মা ! খবিরা অপেক্ষা ক'রে
আছেন তোমাকে আশীর্বাদ করবার জন্যে !

—আর এক মুহূর্ত !

স্নিগ্ধছায়ায় শীতল পদ্মপাতায় ছুটি বকুলফুলের মালা অতি সফজ্জে
তারা রেখেছিল, রোদে যাতে শুকিয়ে না যায় !

সেই ছুটি বকুলমালা ছই সখী শকুন্তলার গলায় পরিয়ে দেয়...

—এই বকুলগাঙ্কে আমরা দুজন থাকবো তোর সঙ্গে সঙ্গে !

শকুন্তলার দু'চোখে নামে আশ্র-বন্ধা !

আর্য্যা গৌতমী শকুন্তলার হাত ধ'রে নিয়ে আসেন, আশ্রম-
পান্তি গে।

আজন্ম তপস্বী মহর্ষি কথ সহসা শকুন্তলার দিকে চেয়ে শিশুর
মতন অধীর হয়ে ওঠেন। সামনে খবিরের দিকে চেয়ে বল্কচ্ছে
আত্মসম্পরণ করেন।

আশ্রমবাসিনী তাপসী আর খবিরা সচন্দন ধান-দুর্বা দিয়ে
একে একে শকুন্তলাকে আশীর্বাদ করেন...

—বীর-প্রসবিনী হও !

—স্বামীর চক্ষে মহাদেবী হও !

—স্বামী-সোহাগিনী হও !

পাথরের মূর্তির মতন কথ দাঁড়িয়ে দেখছেন...সব ঝাপসা হয়ে
যায়...মনে পড়ে, সেই প্রথম দিন...অরণ্য-পথে সহসা দেখেন এক
বৃহৎ পাখী পঙ্ক-বিস্তার ক'রে সঘজাত এক মানব-শিশুকে
আচ্ছাদন ক'রে ব'সে...তপস্বী তিনি, তবুও সেই মুহূর্তের অক্ষমাং

ପ୍ରେରଣାୟ ମାତୃ-ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସେଇ ଶିଶୁ-କହ୍ୟାକେ ତୀର ଆଶ୍ରମେ ନିଯେ
ଆସେନ...ସେଇ ଶିଶୁ-କହ୍ୟା ଆଜ ପତିଗୃହେ ଯାଚେ...ଏମନ ପତି-
ସୌଭାଗ୍ୟଓ କୋନ୍ କହାର ହୟ ? ତବେ କେନ ତପସ୍ୟା-ଶୁଦ୍ଧ ଏହି ବୁକେର
ପାଂଜର କେଂପେ କେଂପେ ଉଠଛେ ?

—ବାବା !

କଥ ଚମକେ ଓଠେନ...ଦେଖେନ, ଶକୁନ୍ତଳା ଅଣାମ କରଛେ !

ତପସ୍ୟାର ସବ ବାଧ ଭେତେ ଅରଣ୍ୟଚାରୀ ଝାବିର ଛ'ଚୋଥ ଫେଟେ ଉପଛେ
ପଡ଼େ ଅକାରଣ ଅଞ୍ଚ-ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ !

ଉଦ୍ଦେଲକଟ୍ଟେ କଥ ବଲେନ, ଆଜ ଶକୁନ୍ତଳା ପତିଗୃହେ ଯାଚେ, ଉଠିକଟ୍ଟିଯ
ଆମାର ଅନ୍ତର ଅଧୀର ହୟେ ଉଠଛେ...ଅଞ୍ଚ-ବାଙ୍ଗେ କଟି ସ୍ତନ୍ତିତ ହୟେ
ଆସଛେ...ସମସ୍ତ ଚେତନା ଜଡ଼ ହୟେ ଯାଚେ...ଆଜିନ୍ ତପସ୍ୟାସିଦ୍ଧ
ସମ୍ମାନୀ ଆମି, ଆମାର ସଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୟ, ତୋମରା ବଲତେ ପାରୋ,
ସଂମାରୀ ଲୋକେରା କି କ'ରେ ଏହି କହ୍ୟା-ବିଚ୍ଛେଦ-ବେଦନା ସହ କରେ ?

ମହାର୍ଥିର ଉଦ୍ଦେଲତାୟ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ହୟେ ଓଠେନ ଗୌତମୀ ।

ମହାର୍ଥିକେ ସ୍ମାରଣ କରିଯେ ଦେନ, ଲଗ୍ନ ଉତ୍ତ୍ରୀଗ୍ର ହୟେ ଆସଛେ !

ନିଜେକେ ସଂସତ କ'ରେ ଶକୁନ୍ତଳାର ମାଥାଯ ହାତ ରେଖେ କଥ
ଆଶୀର୍ବାଦ କରେନ,

—ସଧାତେରିବ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଭର୍ତ୍ତୁ ବହୁମତା ଭବ ! ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଯେମନ ଛିଲ
ସୟାତିର ଗୌରବ, ତେମନି ଗୌରବ ପାକ୍ ତୋମାର ସ୍ଵାମୀ ତୋମାକେ
ପେଯେ !

ଅଞ୍ଚ-ସଜଳ ଚୋଥେ ଶକୁନ୍ତଳା କଥେର ଦିକେ ଢାୟ...

ଦୃଷ୍ଟି ଫିରିଯେ ନିଯେ କଥ ଡାକେନ, ଶାଙ୍କରବ ! ତୋମରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ତୋ ?

—ଆମରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

—ତାହ'ଲେ ଶକୁନ୍ତଳାକେ ନିଯେ ଅଗ୍ରମର ହେ !

ଚାରଦିକ ଥେକେ ଆବାର ମଙ୍ଗଳ-ଶଞ୍ଚ ବେଜେ ଓଠେ...

পঞ্চকন্যা

শকুন্তলাকে নিয়ে প্রিয়মন্দা-অনন্ত্যা ধীরে ধীরে কুটীরের দরজা
পেরিয়ে বাইরে আসে...

বাইরে এসে শকুন্তলা আর এগুতে পারে না... হ'ধারে কুমুম-
বন... বনের প্রত্যেকটি তরু-লতা তার পরমাত্মায়—কেউ সখী, কেউ
সখা, কেউ সন্তান...

কথ বুঝতে পারেন... বুঝতে পারেন আজন্মসাথী এই তরু-
লতাদের ছেড়ে চলে যেতে আজ শকুন্তলার অন্তরে নিদারণ প্রিয়-
বিরোগ ব্যথা জাগছে...

তাই নির্বাক শকুন্তলার হয়ে তিনি মিনতি করেন, হে আশ্রমতরু,
তোমাদের জলসেচন না ক'রে যে কোনোদিন জলগ্রহণ করেনি,
তোমাদের অঙ্গে আঘাত লাগবে ব'লে যে কোনোদিন তোমাদের
পল্লব-ভঙ্গ ক'রে ভূষণ পরেনি, তোমাদের কুমুম-প্রসবকালে যার
আনন্দ আর ধরতো না, সেই শকুন্তলা আজ তোমাদের ছেড়ে
পতিগ্রহে যাচ্ছে, তোমরা তাকে সানন্দে অনুমতি দাও !

বনান্তরাল থেকে কোকিল ডেকে ওঠে... মৃদুমর্মরে জেগে ওঠে
বকুলের ঘনপাতা...

গৌতমী শকুন্তলার দিকে চেয়ে বলেন, বৎস, বন-মর্মরের অরণ্য
তোমাকে আশীর্বাদ করছে, প্রণাম করো অরণ্য-দেবতাকে !

হৃষি কম্পিত কর কপালে ঠেকিয়ে শকুন্তলা প্রণাম করে...

গাছের ছায়ার দিকে চেয়ে কথ বলেন, আর দেরী নয় !

হৃষি সজল চোখ তুলে শকুন্তলা বলে, অনুমতি দিন, লতাবহিণিঅং
বনজোসিনিং দাব আমন্ত্রণস্ম্ ! লতাবহিণি বনজ্যোংজ্ঞার কাছ
থেকে বিদায় নিয়ে আসি !

প্রিয়মন্দা-অনন্ত্যার হাত ধ'রে শকুন্তলা সত্ত-মুকুলিত নব-মল্লিকার
কাছে গিয়ে দাঢ়ায়,

পঞ্চকন্যা

—বনজোসিনি, দূরপরিবটিনী দে ভবিস্ম—বনজ্যোৎস্না, বহু
দূর-পথে আমি চললাম...

ঘন-অঙ্গবাপ্পে রুক্ষ হয়ে আসে কঠ... তবু সখিদের হাত ধ'রে
বলে, তোদের ছজনার ওপর বনজ্যোৎস্নার ভার দিয়ে গেলাম !

সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে এতক্ষণে প্রিয়স্বদা-অনসূয়া কান্নায়
ভেঙে পড়ে,—আমাদের ছজনার ভার কার ওপর দিয়ে যাচ্ছে বলো !

কথ গন্তীরকঠে বলেন, কেঁদো না প্রিয়স্বদা-অনসূয়া ! এসো মা !

কিন্তু ছ-পা গিয়েই শকুন্তলা আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে...

সামনে পথরোধ ক'রে মৃগ-বধু আয়তচক্ষে নিনিমেষ শকুন্তলার
দিকে চেয়ে !

সে গর্ভিনী... দেহ-ভার বইতে পারে না... শকুন্তলার পায়ের
কাছে শুয়ে পড়ে !

বিলম্ব হয়ে যায়... শুভ-লগ্ন বুঝি উত্তীর্ণ হয়ে যায়...

প্রিয়স্বদার দিকে চেয়ে শকুন্তলা বলে, দেহ-ভারের জগ্নে ও দূর-
পথে যেতে পারে না, তোরাছ'বেলা কচিঘাস সংগ্রহ ক'রে এনে দিস !

আর দেরী কোরো না শকুন্তলা । কথ বলেন ।

কথের দিকে চেয়ে শকুন্তলা বলে, যেদিন এই মৃগ প্রসব করবে,
আমাকে খবর দিয়ো !

কথ শকুন্তলার হাত ধ'রে এগিয়ে নিয়ে চলেন...

চলতে চলতে শকুন্তলা কেঁদে ব'লে ওঠে, বাবা, পেছন থেকে
আমার বসন ধ'রে কে টানছে !

কথ ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, ছুটি মৃগশিশু শকুন্তলার বসন ধ'রে
টানছে !

জন্ম দিয়েই তাদের মা ম'রে যায়, সেই থেকে শকুন্তলা এই
ছুটি মৃগশিশুকে মাতৃ-ন্মেহে পালন করেছে !

পঞ্চকন্ত্র।

আজ কোন্ অজ্ঞাত আকর্ষণের অমোঘ নিয়মে তারাও বুঝতে
পেরেছে, শকুন্তলা তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে !

শকুন্তলা কেঁদে ওঠে, তাত ! এদের ছেড়ে কি ক'রে যাবো ?

কথ বোঝাতে যাচ্ছিলেন, গৌতমী বাধা দেন...গৌতমী বুঝতে
পারেন, পিতা-পুত্রী, কেউই পারবে না শুভ-লগ্নের মর্যাদা রাখতে !

তাই কাজের কথা তোলেন...কথের দিকে চেয়ে বলেন, আপনি
এখান থেকেই শকুন্তলাকে বিদায় দিন !

কথ বলেন, না, শাস্ত্রের বিধান হলো সরোবর পর্যন্ত কথাকে
এগিয়ে দেওয়া...তাই তপোবন-পথের ওপর প্রথম সরোবর থেকেই
আমরা ফিরে আসবো !

—তাই হোক !

গৌতমী শকুন্তলার হাত ধ'রে দ্রুত এগিয়ে চলেন...

সরোবর প্রান্তে বৃহৎ বটের ছায়ায় কথ আশ্রমবাসীদের সঙ্গে
এসে দাঁড়ান...

শকুন্তলার সঙ্গে যাবে মহর্ষির আশীর্বাদ নিয়ে শান্তিরব ও আর্যা
গৌতমী আর শারদত !

কথ বারবার শান্তিরবকে স্মরণ করিয়ে দেন, যা যা করতে হবে ।

আসন্ন বিদায়-লগ্ন...তবু তাকে কেউ স্থীকার করে না...

বাধ্য হয়ে গৌতমী বলেন, শকুন্তলা, পিতাকে প্রণাম করো !

শকুন্তলা নত হয়ে প্রণাম করে...

বুকের কচে তুলে নিয়ে মহর্ষি-শেষ-আশীর্বাদ করেন,—পতিগৃহে
গুরুজনদের শুশ্রাৰ্ব করবে, সপত্নীদের সঙ্গে প্রিয়স্থীর মত ব্যবহার
করবে...পরিচারিকাদের কাছে মৃত্তিমতী দাক্ষিণ্য হবে...কখনো
কারুর কাছে নিজের সৌভাগ্যের গব' করবেনা...যদি কখনো স্বামী ক্লাট

পঞ্চকন্ত্র

ব্যবহার করেন, কৃত হয়ে তুমি তার প্রত্যক্ষের দিয়ো না... এইভাবেই
নব-বধূ ক্রমশঃ গৃহিণীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়... এর বিপরীত ব্যবহারে
শুধু সকলের বেদনাই বাড়ে... এ-কথা কোনোদিন ভুলো না শকুন্তলা!

পাছে আবার অন্য কথা আসে, গৌতমী শকুন্তলাকে বলেন,
এবার তোমার প্রিয়স্থীদের আলিঙ্গন করো !

কথের দিকে চেয়ে শকুন্তলা শেষ মিনতি জানায়, আমার সঙ্গে
যেতে এদের অনুমতি দিন् !

—তা হয় না বৎস ! তোমার মতন এদেরও তো যোগ্য স্বামীর
হাতে তুলে দিতে হবে !

ইচ্ছে ক'রে অনসূয়া-প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে নিয়ে একটু দূরে স'রে
আসে...

কম্পিতকণ্ঠে অনসূয়া বলে, দুর্ঘাতের দেওয়া সেই আংটিটা হাতে
আছে তো ?

সহসা এই প্রশ্নে শকুন্তলার বুক কেঁপে ওঠে...

—এ-কথা কেন বলছিস্ অনসূয়া ?

অনসূয়া বলে, কোনো কারণ নেই... তবু ভয় হয় মনে—যদি
কোনো কারণ ঘটে, এই আংটি দেখাবি... তাহ'লে সব ঠিক হয়ে
যাবে !

ভীত শুকরণ্থে শকুন্তলা বলে, কি কারণ ঘটবে ? কি ঠিক হবে ?

—তোকে ছেড়ে কখনো থাকিনি... তাই আজ অকারণেই ভয়
হয়... তা ছাড়া আর কিছু নয় !

শান্তির ব এসে দাঁড়ায়...

—বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে তপ্তী !

প্রিয়ম্বদা-অনসূয়া শকুন্তলাকে নিয়ে পথের ওপর এসে দাঁড়ায়...

শকুন্তলার চেতনায় যেন সব ঝাপসা হয়ে আসে...

পঞ্চকন্ত্রা

কথের দিকে চেয়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠে, আবার কবে তপোবনে
ফিরে আসবো ?

স্থিরকষ্টে কথ বলেন, সমাগরা পৃথিবীর সন্নাত্তী রূপে নিজের
কর্তব্য সেরে যেদিন স্মরণে পুত্রকে সিংহাসনে বসাবে, স্বামীকে
সঙ্গে নিয়ে সেদিন আবার তপোবনে ফিরে আসবে !

গৌতমী প্রিয়স্বদা-অনসূয়াকে ইঙ্গিত করেন, মহর্ষিকে নিয়ে
আশ্রমে ফেরো !

তারপর শকুন্তলার হাত ধ'রে বলেন, এসো বৎস ! শঙ্খরব,
পথ দেখিয়ে চলো !

যন্ত্রচালিতের মতন এগিয়ে যেতে যেতে শকুন্তলা ঘাড় ফিরিয়ে
পেছনের দিকে চায়...গাছ-পালা, তরু-লতা, আশ্রম-কুটীর,
লোকজন সব ঝাপসা একাকার সবুজ হয়ে আসে...

মহর্ষি কথের পাশে দাঁড়িয়ে পাথরের মুর্তির মতন প্রিয়স্বদা-
অনসূয়া বন-পথের দিকে চেয়ে থাকে...

সহসা অনসূয়া চীৎকার ক'রে ওঠে, অন্তরিহিতা সউন্তলা
বনরাইএ...বনের আড়ালে শকুন্তলা হারিয়ে গেল...

কোথায় শকুন্তলা ?

রাণী হংসপদিকার নিদারণ অভিমান হয়েছে...

অভিমানের কারণ রাজা ছদ্মন্ত...

হংসপদিকা বুঝতে পারে, রাজার স্পর্শে আর সে-উত্তাপ নেই...
যে-বাসন্তী-পূর্ণিমায় দুঃস্মন্ত তার অন্তর জয় করেন, আবার ফিরে এসেছে
সেই বাসন্তী-পূর্ণিমা, কিন্তু হংসপদিকা আজ একা বসন্ত-নিশি জাগে...

পঞ্চকন্যা।

তুম্ভন্ত আজ রাণী বস্তুমতীর অন্তর-জয়ে ব্যস্ত...

এই কুঞ্জ-ভবনের পথ দিয়ে তুম্ভন্ত যাবেন রাণী বস্তুমতীর কুঞ্জে...

হংসপদিকা তাই ব্যর্থ-কুশুমের বোৰা অঙ্গে বহন ক'রে আপনার
মনে গেয়ে ওঠে :

—হায় মধুকর,

নতুন মধু-র লোভে আজ তুমি সহকার-মঞ্জৰীকে ভুলে গিয়েছো,—

নিশ্চিতে ফুটেছে নতুন কমল,

তারই মধু-আস্বাদনে আজ মেতেছো তুমি...

আজ ভুলে গিয়েছো সহকার-মঞ্জৰীকে... হায় মধুকর !

বিদ্যুক মাধব্যের সঙ্গে কুঞ্জ-পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে তুম্ভন্ত
থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন...

কানে আসে রাণী হংসপদিকার বিলাপ-সঙ্গীত...

বিদ্যুক হেসে বলে, বুঝতে পারছেন গানের মর্ম ?

—বুঝতে তো পারছি, কিন্তু আজ রাত্রিতে রাণী বস্তুমতীর কাছে
আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ... আমাকে রক্ষা করো বন্ধু !

বিদ্যুক অট্টহাস্ত ক'রে ওঠে,

—আপনি হলেন সকলের রক্ষক... আমি কি ক'রে আপনাকে
রক্ষা করবো ?

—তুমি পারো... নাগরিকতায় তুমি পটু... রাণী হংসপদিকার
ভবনে গিয়ে তুমি তাকে বার্তালাপে ভুলিয়ে রাখো !

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাধব্য বলে, রাজাৰ বয়স্ত হওয়া—রাজা-হওয়াৰ
চেয়ে কঠিন !

মাধব্য রাণী-হংসপদিকার কুঞ্জ-ভবনের দিকে অগ্রসর হয়...

তুম্ভন্ত ঘুরে মাধবী বিতান ধ'রে রাণী বস্তুমতীর প্রতীক্ষা-কুঞ্জের
দিকে আনন্দে এগিয়ে চলেন...

পঞ্চকন্ত্র

শকুন্তলা তখন রাজধানী প্রবেশ-মুখে শচী-তৌরের মন্দিরের
চতুরে নিজিত সহযাত্রীদের একধারে নিজাহীন ব'সে মুহূর্ত গুনছে...

নিজের হস্পন্দনে সে শুনতে পায় গতি-মন্ত্র প্রতি-মুহূর্তের
গুরু পদধ্বনি...

রাত-প্রভাতে বিদ্যুক ছুঁস্তের কাছ থেকে ছুটি নেয়...আজ
রাণী হংসপদিকা নিজে রেঁধে তাকে খাওয়াবে...

ছুঁস্ত হেসে বলেন, কিন্তু সকাল থেকে সেখানে কি করবে ?

মাধ্যম হেসে বলে, রাণীর পরিচারিকাদের সাহায্য করবো !

ছুঁস্ত অট্টহাস্ত ক'রে ওঠেন...

ভরিত-পদে বিদ্যুক চলে যায়...

কুঞ্জ-দ্বারে কঞ্চুকী এসে দাঁড়ায়...

— মহর্ষি কথের আশ্রম থেকে কয়েকজন তপস্বী ও তপস্বিনী
রাজ-দর্শনে এসেছেন।

ছুঁস্ত বিশ্বিত হয়ে ভাবেন, হঠাৎ মহর্ষি কথের আশ্রম থেকে...
কি ব্যাপার ?

— তাঁদের কি সভা-কক্ষে নিয়ে যাবো ?

ছুঁস্ত ঘাড় নাড়েন, না, সভাকক্ষে নয়...তুমি পূর-পুরোহিতকে
বলো, যথারীতি বৈদিক-প্রথায় তাঁদের অভিনন্দিত ক'রে তিনি যেন
নিজে তাঁদের সঙ্গে ক'রে অগ্রিহোত্র-ভবনে নিয়ে আসেন, আমি
সেইখানেই তাঁদের অপেক্ষায় থাকবো।

অভিবাদন ক'রে কঞ্চুকী চলে যায়...

সামনে শঙ্করব ও শারদ্বত, পেছনে আর্যা গৌতমী...গৌতমীর

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠ

ପେହନେ ଅବଗୁର୍ଣ୍ଣନବତୀ ଶକୁନ୍ତଲା...ତାରା ଅଗିହୋତ୍ର-ଭବନେ । ପ୍ରବେଶ
କରେନ...

ଦୁଇନ୍ତ ଆସନ ଥେକେ ଉଠେ ଦାଡ଼ିୟେ ତାଦେର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରେନ...

—ମହିର କଥେର କୁଶଳ ?

ଶାଙ୍କରବ ଉତ୍ତର ଦେୟ,

—ଦୁଇନ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଅକୁଶଳ କୋଥାୟ ?

—ଆଜ ଆମାର ରାଜା-ଉପାଧି ସାର୍ଥକ ହଲୋ...ମହିର କି କୋନୋ
ଆଦେଶ ଆଛେ ?

—ମହିର ଆମାକେ ଯା ବଲତେ ବଲେଛେନ, ତାର କଥାୟ ଆମି ତାଇ
ଆପନାକେ ଜାନାଛି : ସୋମତୀର୍ଥ ଥେକେ ଫିରେ ଏସେ ସଥନ ଶୁନଲାମ,
ଆପନି ଶପଥପୂର୍ବକ ଆମାର ପାଲିତା କଣା ଶକୁନ୍ତଲାକେ ପତ୍ରୀରାପେ
ଗ୍ରହଣ କରେଛେନ, ଆନନ୍ଦେ ଆମି ତା ଅଛୁମୋଦନ କରି...

ବିପୁଲ ବିଶ୍ୱାସେ ଦୁଇନ୍ତ ବଲେନ, କେ ଶକୁନ୍ତଲା ?

ଅବଗୁର୍ଣ୍ଣନବତୀର ଦିକେ ଆଙ୍ଗୁଲ ଦେଖିୟେ ଶାଙ୍କରବ ବଲେ, ଏହି
ଅବଗୁର୍ଣ୍ଣନବତୀ ।

ଏତକ୍ଷଣେ ଦୁଇନ୍ତର ନଜରେ ପଡ଼େ, କେ ଏ ବିଚିତ୍ରା ନାରୀ ? ଅବଗୁର୍ଣ୍ଣନେ
ତାର ମୁଖ ଦେଖା ଯାଚେ ନା, କିନ୍ତୁ ଅବଗୁର୍ଣ୍ଣନ ସତ୍ତ୍ଵେ ଜ୍ଵଳ-ରୂପ-ବହିର
ପ୍ରଭା ଯେନ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହଚ୍ଛେ !

ଶାଙ୍କରବ ବଲେ, ଏତକ୍ଷଣେ ବୋଧହୟ ଆପନି ବୁଝାତେ ପେରେଛେନ...
ଶକୁନ୍ତଲା ଆଜ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା, ତାଇ ମହିର ତାକେ ଆପନାର କାହେ
ପାଠିଯେଛେନ, ତାକେ ଗ୍ରହଣ କ'ରେ ପୁରୁ-ବଂଶେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁଷ୍ଣ ରାଖୁନ !

ଦୁଇନ୍ତ ଶୁକ୍ଳକଟେ ବ'ଲେ ଓଠେନ,—ଏକି ଅସନ୍ତବ ଅବାସ୍ତବ କଥା
ବଲେଛେନ, ଏହି ଅବଗୁର୍ଣ୍ଣନବତୀ ନାରୀ ଆମାର ବିବାହିତା ପତ୍ରୀ ?

ଆର୍ଯ୍ୟା ଗୌତମୀ ତ୍ରୁଦ୍ରକଟେ ବଲେନ, ଏବଂ ଆପନାର ପୁତ୍ରେର
ଜନନୀ !

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠ

ତତୋଧିତ ବିଶ୍ଵିତ ହୟେ ଦୁଷ୍ଟ ବଲେନ, ଏକି କାଳନିକ ସଟନା
ମୁଣ୍ଡ କରଛେନ ଆପନାରା ?

ଅବଗୁର୍ବନେର ଆଡାଲେ ସେନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଶିଖା ନ'ଡେ ଓଠେ...

ଶାଙ୍କରବ କ୍ରୂଦ୍ଧକଠେ ବଲେ,

—ଭେବେଛିଲାମ ରାଜା ହଲେଓ, ସେ-ବଂଶେ ଜମ୍ବେଛେନ ସେ-ବଂଶେର
କିଛୁ ପୁଣ୍ୟ ଆପନାର ମଧ୍ୟେ ଆଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଥି ଦେଖଛି ଆମାଦେର ସବ
ଧାରଣା ଭୁଲ !

ଆର୍ତ୍ତକଠେ ଦୁଷ୍ଟ ବଲେନ, ଅକାରଣ ଆମାକେ ତିକ୍ତକଥା ଶୋନାଛେନ
...ଆମି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରେଓ ଅରଣ କରତେ ପାଇଁ ନା ଯେ, ଅଶୁରାପ
ସଟନା କଥନୋ ଆମାର ଜୀବନେ ସଟେଛିଲ...ସେକେତ୍ରେ ଆପନିଇ ବଲୁନ,
ରାଜା ହୟେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ପର-ନାରୀକେ କି କ'ରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବ'ଲେ ଗ୍ରହଣ
କରତେ ପାରି ?

ଏ-ରକମ ସେ ପରିଚିତି ହବେ ତା ତାରା କାଳନାଓ କରତେ ପାରେନନି !

ଗୌତମୀ ଅଧୀର ହୟେ ଓଠେନ, ଶକୁନ୍ତଲାର ଦିକେ ଚେଯେ ବଲେନ,
ସବ ଲଜ୍ଜା ତ୍ୟାଗ କ'ରେ ଆମି ନିଜେର ହାତେ ତୋମାର ଅବଗୁର୍ବନ
ମୋଚନ କରଛି...ଚେଯେ ଢାଖୋ ରାଜା, ଏ ମୁଖ ତୁମି କଥନୋ କୋଥାଓ
ଢାଖୋନି ?

ଗୌତମୀ ଶକୁନ୍ତଲାର ଅବଗୁର୍ବନ ସରିଯେ ଫେଲେନ... ଧୂତ୍ରିନ ଅଗ୍ନିଶିଖା
ଜଲେ ଓଠେ...

ମହାବିଶ୍ୱୟେ ଦୁଷ୍ଟ ଚେଯେ ଥାକେନ, ଆକାଶେର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେନ
ଅକ୍ଷାଂ ଶ୍ଵେତ ହୟେ ତାର ସାମନେ ଦ୍ଵାଡିଯେ...କୋନ୍ ପ୍ରଚନ୍ଦ ମୋହାଗି-
ଶିଖାର ଦୁଷ୍ଟି ସାରା ମୁଖ ଛାଡ଼ିଯେ ଦିଯେଛେ ଜଲ-ରଙ୍ଗ-ବିଭା...ଉପ୍ୟାଚିକା
ହୟେ ଏହି ବିଶେର ବିଶ୍ୱଯ ତାର କାହେ ଆଅସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରତେ ଏସେଛେ,
ଅର୍ଥଚ ବିଧାତାର ଏ କି ନିର୍ମମ ପ୍ରହସନ, ତାକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରା
ଛାଡ଼ା କୋନୋ ପଥ ନେଇ !

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠୀ

ହୃଦୟକୁ ତବୁଓ ନୀରବ ଦେଖେ ଗୌତମୀ ତୁଳକଟେ ବ'ଲେ ଓଠେନ,
ଏଥିନେ ଆସୁବନ୍ଧନା କରଛୋ ରାଜା ?

ବିବ୍ରତକଟେ ହୃଦୟକୁ ଶକୁନ୍ତଲାର ଦିକେ ଚେଯେ ବଲେନ, ହେ ଅପରିଚିତା,
ଆମି ତୋମାର କାହେଇ ଆବେଦନ କରଛି, ଆମାକେ ଅସ୍ଵିକାର କ'ରେ
ଆମାକେ ଏ କଳଙ୍କ ଥେକେ ମୁକ୍ତ କରୋ...ଅଥବା ଏମନ କୋନୋ ଚିହ୍ନ
ତୋମାର କାହେ ଆଛେ, ଯା ଦିଯେ ତୋମାର ଦାବୀ ପ୍ରମାଣ କରତେ ପାରୋ ?

ଶକୁନ୍ତଲାର ମୁଦିତ ହୁ'ନୟନ ଥେକେ ଅଞ୍ଜନ୍ଧାରା ଗଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ...

ଧୀରେ ଚୋଥ ମେଲେ ଚାଯ...କଷ୍ପିତକଟେ ବଲେ, ତୋମାର ଶପଥ
ତୁମି ଭୁଲେ ଯେତେ ପାରୋ, ତୁମି ଅସ୍ଵିକାର କରତେ ପାରୋ ଶକୁନ୍ତଲାକେ
...କିନ୍ତୁ ଆମି କି କ'ରେ ତୋମାକେ ଅସ୍ଵିକାର କରବୋ ? ଆମାକେ
ଦେଖେଓ ସବୁ ତୁମି ପରନାରୀ ବ'ଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରଛୋ, ତଥନ
ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ କି ହବେ ? ତବୁଓ ଏହି ଢାଖୋ ତୋମାର ନାମାକ୍ଷିତ
ଆଂଟି...

ଶକୁନ୍ତଲା ଅନ୍ୟମନସ୍କଭାବେ ହାତ ଦିଯେ ଆଙ୍ଗୁଲେ ଆଂଟିଟା ଖୋଜେ...

—ଏହି ଆଂଟି ତୁମି ନିଜେ ଆମାର ଆଙ୍ଗୁଲେ ପରିଯେ ଦିଯେଛିଲେ...
ହା�ୟ, ଆର୍ଯ୍ୟା ଗୌତମୀ...!

ଶୁଦ୍ଧ ପାଂଶୁ ବିବର୍ଣ୍ଣମୁଖେ ଶକୁନ୍ତଲା ଗୌତମୀର ଦିକେ ଚେଯେ ଥାକେ...
ଆଙ୍ଗୁଲେ ଆଂଟି ନେଇ !

—ଆଂଟି କୋଥାଯାଇ ଗେଲ ?

ଗୌତମୀ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କ'ରେ ଓଠେନ...ଆର୍ତ୍ତ ବିଷକ୍ତକଟେ ବଲେନ,
ନିଶ୍ଚଯଇ ତାହ'ଲେ ଶଟୀ-ତୀର୍ଥେ ସରୋବରେ ମ୍ଲାନେର ସମୟ ପ'ଡ଼େ ଗିଯେଛେ !

ବିପନ୍ନମୁକ୍ତ ହୃଦୟ ହେସେ ଓଠେନ, ଶକୁନ୍ତଲାର ଦିକେ ଚେଯେ ବଲେନ,
ଅପୂର୍ବ ଅଭିନୟ ! ଏ-ରକମ ହଠାତ୍-ବୁଦ୍ଧି ତୋମାଦେର ମତନ ଶ୍ରୀଲୋକେର
ସ୍ଵଭାବତଟି ଆସେ !

ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେର କଣ୍ଠା ଶକୁନ୍ତଲାର ଚୋଥେ ଆଶ୍ରମ ଜଲେ ଓଠେ...ହିନ୍ଦି

পঞ্চকন্যা

অবিচলিতকষ্টে দুঃস্মন্তের দিকে চেয়ে বলে, তুমি অনার্য, তাই
এইরকম গার্হিত কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারলে !

তিক্ত অভিশাপের বাণী তবু কষ্টে এসে আটকে যায়...হায়
শকুন্তলা !

শুধু আপনার মনে ঘৃতকষ্টে বলে, আমার প্রেমকে তুমি শুধু
অস্থীকারই করলে না, তার মাথায় একি কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে
দিলে !

শান্তির পাশেই ছিল...রাজার ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল,
শকুন্তলার কথা কানে যাওয়ায় আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে...

—স্বেচ্ছাচারিণী তুমি, গুরুজনদের গোপন ক'রে আত্মান করে-
ছিলে, আজ তার যোগ্য শাস্তি পেয়েছো !

শকুন্তলার অন্তর আর্তনাদ ক'রে ওঠে, হায়, কে তাকে বুবাবে !

শান্তির দুঃস্মন্তের দিকে চেয়ে বলে, মহবি কথের আদেশ বহন
ক'রে আমরা এসেছিলাম এবং তাঁর আদেশমতই শকুন্তলাকে
এখানে রেখে গেলাম...এ ছাড়া আমাদের আর কোনো কর্তব্য
নেই...চলুন আর্য্যা গৌতমী !

বেগে শান্তির পৌত্র গৌতমীকে নিয়ে বেরিয়ে যায়...

শকুন্তলা ছুটে গিয়ে শান্তির পথে পথরোধ ক'রে দাঢ়ায়, এভাবে
আমাকে পরিত্যাগ ক'রে আপনারাও চলে যাচ্ছেন ?

তেমনি ক্রুদ্ধকষ্টে শান্তির বলে, তোমার জীবনের ভার আমরা
বইতে পারি না...তুমি জানো দুঃস্মন্ত তোমার স্বামী...বৃহৎ তাঁর
ভবন...সেখানে দাসী হয়েও তোমাকে থাকতে হবে ! আজ কেন
স্বাধীনা হতে ভয় পাচ্ছা ?

বজ্র-আঘাতে চলে যায় বেদনার বোধ...

সর্ব-পরাজয়ের মধ্যে অন্তরে জেগে ওঠে অপরাজিতা নারী...

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠ

ଏଭାବେ ଅସହାୟ ଅଞ୍ଚଳଜଳେ ନିଜେର ନାରୀଙ୍କେ ଆର ମେ ଲାଞ୍ଛିତ ହତେ
ଦେବେ ନା...ଶକୁନ୍ତଳା

ଶକୁନ୍ତଳା ହିର ଦାଁଡ଼ିଯେ ଦେଖେ, ତପସ୍ତୀରୀ ଚଲେ ଗେଲେନ...ପେହନେ

ଫିରେ ଦେଖେ, କାଉକେ ଦେଖିତେ ପାଯ ନା !

ଆଜ ଜଗତେ ତାକେ ଆର କାରାରଇ କୋନୋ ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ...

ସହସା ଉର୍ଧ୍ଵ ଆକାଶେର ଦିକେ ଚେଯେ ଦେଖେ...

ଦେଖେ, ମାତୃ-ଶ୍ଵରେର ମତନ ଏକଟା ଜ୍ୟୋତିର ରେଖା ଆକାଶ
ଥିକେ ତାର ସାମନେର ପଥେ ଏସେ ପଡ଼େଛେ...

ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁନନେ ପାଯ, କେ ଯେନ ସ୍ନିଙ୍କକଟେ ବଲଛେ, ବଂସ, ଆମାକେ
ଅଛୁମରଣ କରୋ !

ସେଇ ଆକାଶ-ଚୁଯ୍ୟତ ଜ୍ୟୋତିରେଖାକେ ଅଛୁମରଣ କ'ରେ ଶକୁନ୍ତଳା
ଏଗିଯେ ଚଲେ...

ଅଗିହୋତ୍ର-ଭବନେ ସ୍ତନ୍ତ୍ରିତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବିମୁଢ଼େର ମତ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଥାକେନ...

ସାମନେ ରାଜ-ପୁରୋହିତ...

ସହସା ଯେନ ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ସମ୍ବିନ୍ଦ୍ରି ଫିରେ ଆସେ,

—ପୁରୋହିତ, ଏକ କାଜ କରୋ...ସତକ୍ଷଣ ନା ଏ ନାରୀର ସନ୍ତାନ-
ପ୍ରସବ ହୟ ତୁମି ଓଂକେ ତୋମାର ଗ୍ରହେ ଆଶ୍ରଯ ଦାଓ ! ଦେଖଛୋ କି ?
ଯାଓ, ଓକେ ଫିରିଯେ ନିଯେ ଏସୋ !

ପୁରୋହିତ କ୍ରତ ବେରିଯେ ଯାନ...

କରେକ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ପରେ ପୁରୋହିତ ବ୍ୟାଗଭାବେ ଫିରେ ଆସେନ...ଏକା...

—ମହାରାଜ, ମେ-ନାରୀକେ କୋଥାଓ ଖୁଁଜେ ପେଲାମ ନା !

—ତପସ୍ତୀଦେର ଦେଖା ପେଲେ ନା ?

—ତାଦେର ଦେଖା ପେଯେଛି...କିନ୍ତୁ ଶକୁନ୍ତଳା ତାଦେର ସଙ୍ଗେ ନେଇ !

পঞ্চকল্প।

শৃঙ্খলারে প্রতিবনির মতন দুঃস্থিতের অন্তর থেকে জেগে ওঠে,
—তাহ'লে...কোথায় সে-নারী ?

অগ্নিহোত্র-ভবনের দ্বারে প্রতিহারিণী বেত্রবতী এসে দাঢ়ায়...
সন্ধিমে নতি জানিয়ে বলে, রাণী বস্ত্রমতী শয়ন-কক্ষে আপনার
প্রতীক্ষা করছেন !

যদ্রচালিতের মতন দুঃস্থিত বলেন, কোথায় শয়নকক্ষ ?
বেত্রবতী বিশ্঵ায়ে রাজা'র দিকে চায়...

শুষ্ককষ্টে দুঃস্থিত বলেন, বেত্রবতী, তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে
নিয়ে চলো !

বিমৃঢ়ের মতন দুঃস্থিত বেত্রবতীকে অনুসরণ ক'রে চলেন...

শূল থেকে হুরা-গৃহে

রক্ষীরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ধীবরকে নগর-পালের কাছে নিয়ে আসে...
—প্রভু, এই ধীবরের কাছে রাজ-নামাঙ্কিত বহুমূল্য হীরক-
অঙ্গুরীয় পাওয়া গিয়েছে...এই সেই অঙ্গুরীয় !

নগর-পাল দেখে, সত্যই আংটিতে রাজা'র নাম অঙ্কিত রয়েছে
...এই চৌর্যের একমাত্র শাস্তি, প্রাণদণ্ড !

ধীবর কেঁদে বলে, প্রভু, আমি চোর নই...বিশ্বাস করুন,
আমি সামাজ্য জেলে...এ আংটির কি দাম, তা আমি কিছুই জানি
না, তাই সরল বিশ্বাসে একজন জহরীকে দেখাচ্ছিলাম. সেই
সময় রাজরক্ষীরা আমাকে বন্দী করে !

মুখ বিকৃত ক'রে নগর-পাল বলে, চুরি করেননি তো এই আংটি

পঞ্চকন্তা

কি ক'রে পেলেন ধীবর-রাজ ? বক্রত্ব করবার জন্যে মহারাজ
আপনাকে উপহার দিয়েছিলেন ?

—বিশ্বাস করুন প্রভু, জালে একটা বড় ঝইমাছ ওঠে, সেই
ঝইমাছের পেটের ভেতর থেকে এই আংটি পেয়েছি !

—একেবারে গল্ল সাজিয়ে ঠিক ক'রে এসেছো...পাকা চোর !
নজরবন্দী ক'রে রাখো, আমি একবার মহারাজকে এই আংটি
দেখিয়ে আসি...

আংটি নিয়ে নগর-পাল চলে যায়...

ধীবর কেঁদে রক্ষী ছ'জনের পায়ে পড়ে...

—প্রভু, বাঁচান্ত আমাকে !

রক্ষীরা পা দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দেয়—স'রে যা বেটা, গায়ে
কি হৃগৎ !

ধীবরকে শুনিয়ে শুনিয়ে তারা গল্ল করে,

—শূলে মরচে প'ড়ে গিয়েছে...একটু শাশ দিয়ে নিতে হবে।

—আমার আপসোস ছিল, একটাকেও শূলে চড়াতে পারিনি !

—বেটার গায়ে যা গন্ধ !

—শূলে চড়াবার আগে জলে চুবিয়ে নেবো !...

ধীবরের মনে হয়, পায়ের তলার ঘাসগুলো ঘাস নয়, এক-একটা

শূলের মুখ...

কিছুক্ষণ, পরে নগর-পাল ছুটতে ছুটতে আসে...

হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, ছেড়ে দে... ছেড়ে দে...

ধীবর অবাক হয়ে যায়...

নগর-পাল নিজে তার বক্রন-রজ্জু খুলে দেয়, কিছু মনে কোরো

পঞ্চকন্যা

না ভাই...এই নাও, মহারাজ এই স্বর্ণমুদ্রার থলে তোমাকে উপহার
দিয়েছেন !

কাঠের পুতুলের মতন রক্ষী ছ'জন ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চায়,
—কি হলো প্রভু ?

নগর-পাল বলে, আংটি দেখে রাজা কি রকম হয়ে গেলেন...
পাগলের মতন ছট্টফট্ করতে লাগলেন...

—তারপর ? তারপর ?

—মন্ত্রীকে দিয়ে এই স্বর্ণমুদ্রার থলে আনিয়ে...

—ওঁকে দিতে বললেন বুবি ?

—হ্যাঁ, আর বললেন, তোমরা ছ'জনে সঙ্গে ক'রে সমন্বানে
ওঁকে বাড়ী পৌছে দেবে।

—সে আর বলতে ! ওঁর কাছ-ছাড়া আমরা হবো না...চলুন...
ধীবর-রাজ...

হতবাক ধীবরকে নিয়ে রক্ষী ছ'জন রাজপথে এসে দাঢ়ায়...

হেসে ধীবরের কানে-কানে বলে, কাছেই খুব ভালো সুরা
পাওয়া যায়...আপনি যদি ইচ্ছা করেন...

ধীবর হেসে ঘাড় নাড়ে...

গলা ধরাধরি করে তিনজনে সুরা-গৃহের দিকে চলে...

মুকুলিত আত্ম-মুকুলের স্বাসে এসেছে বসন্ত...

কিন্তু নিষ্ঠক নগরী...

রাজার আদেশে নিষিদ্ধ হয়েছে বসন্তোৎসব...

এমন কি, কোনো মুকুলিত তরুর শাখা পর্যন্ত কেউ ভাঙতে
পারবে না...

নিষ্ঠক রাজ-পুরী...

পঞ্চকন্তৃ

রাজার মর্যাদেনা বুঝে রাণী বস্তুমতী চতুরিকা-নিপুণিকাদের
আদেশ করেছেন পা থেকে নৃপুর খুলে ফেলতে... রাজ-অন্তঃপুরে,
আর ওঠে না নৃপুর নিক্ষণ...

আজ সকলেই জেনেছে, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-রহস্য...

অঙ্গুরীয় দেখার সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্মিন্তের মনে জেগে উঠেছে,
গতরাত্রির ঘটনার মত সমস্ত পূর্ব-স্মৃতি...

জীবনের সর্বোত্তম প্রেমকে তিনি নিজে চরম লাঞ্ছনায় ফিরিয়ে
দিয়েছেন...

এমন ভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন যে তাকে ফিরিয়ে আনবার পথ
পর্যন্ত নেই...

কে জানে কোথায় শকুন্তলা?

নিঃসন্তান তিনি... শকুন্তলাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
ফিরিয়ে দিয়েছেন তাঁর সন্তান-ভাগ্যকে...

নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক দুঃস্মৃত, কিন্তু সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে
পুরুৎশ... প্রামত ঘাতকের মত তিনি নিজের হাতে আঘাত করেছেন
এই দিব্য-মহিমার ধারাকে...

শকুন্তলাহীন এই অঙ্ককারে কণামাত্র সান্ত্বনার আলো নেই...

অস্রার মাতৃ-হৃদয় নেই... কিন্তু লাঞ্ছিত-প্রেমের বেদনাকে সে
বোঝে... সেখানে ব্যথিত হয়ে ওঠে মেনকার অন্তর শকুন্তলার জন্মে...

লক্ষ্য করে সহচরী সান্ত্বনার অন্তর শকুন্তলার জন্মে...
যদি কোনো সংবাদ সংগ্রহ করা যায়, সান্ত্বনার আসে মন্ত্রে...

সকলের অদৃশ্য-ভাবে সান্ত্বনার ঘুরে বেড়ায় রাজ-প্রামাদে,
অন্তঃপুরে দুঃস্মিন্তের আশে-পাশে... নিভৃত নির্জনতায় দুঃস্মিন্তের একান্ত-
উচ্চারিত মর্মকথাও সে স্পষ্ট শুনতে পায়...

পঞ্চকন্তা

শুনতে শুনতে আনন্দিত হয়ে ওঠে তার মন...অকারণে
প্রত্যাখ্যাত হোক শকুন্তলা, কিন্তু সেই অকারণ-প্রত্যাখ্যাতাই আজ
বিজয়িনী...যাকে দুঃস্থি ফিরিয়ে দিয়েছেন, সে-ই আজ তাঁর সমস্ত
চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে...উপস্থিত যা-কিছু, তাকে শৃঙ্খ
নির্বর্থক ক'রে দিয়েছে সে অমুপস্থিত !

আনন্দিত হয়ে ওঠে সান্তুষ্টী, ব্যর্থ হয়নি প্রেম !

রাজ্য, রাজ-সভায়, রাজ-অন্তঃপুরে...কুঞ্জে...কুঞ্জ-ভবনে...দুঃস্থির
ভূবনে আজ একটা কথাই অহনিশি বাজছে, ফিরে গিয়েছে শকুন্তলা!...

অন্তঃপুরে রাণীদের মধ্যে চলে গিয়েছে সপন্নী-বিদ্রে...

দুঃস্থি অধিকাংশ সময়ই অন্তঃপুরের বাইরে একা নির্জনে কুঞ্জ-
ভবনে থাকেন...রাণীরা প্রতিহারিণী পাঠিয়ে উত্যক্ত করেন না...

যদি কখনো অন্তপুরে আসেন, নিস্পৃহভাবে সাধারণ কথাবার্তা
বলেন...হঠাতে নিজের অজ্ঞাতে কখন শকুন্তলার কথাই বলতে আরস্ত
করেন...রাণীরা বাধা দেন না...কিন্তু সহজাত সৌজন্যে অকস্মাত
মনে পড়ে অসমীচীন হচ্ছে...নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যান...

বয়স্ত মাধব্যকে ডেকে একই অহুশোচনা বারবার করেন...

—শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের সময় তুমি উপস্থিত ছিলে না, তাই
তখন তোমার কোনো দোষ ঘটেনি...কিন্তু তপোবন থেকে যখন
ফিরে এলাম, তুমি তো তপোবন-বাসে আমার সঙ্গে ছিলে, একবারও
তুমি কেন শকুন্তলার কথা উৎপন্ন করোনি ?

ঝানকঠো বিদ্যুক বলে, আমি বয়স্ত, মূর্খ, আপনার কথায় বিশ্বাস
করেছিলাম...নগরে ফিরে আসবার সময় আপনি আমাকে
বলেছিলেন, শকুন্তলা সবক্ষে আপনার কোনো কথাই যেন আমি

পঞ্চকন্তা

সত্য ব'লে গ্রহণ না করি ! আমি মূর্খ, রাজ-বাক্য সত্য ব'লে
বিবেচনা করেছিলাম !

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুঃস্থি বলেন, আমার যোগ্য শাস্তি পেয়েছি...
তোমার কাছ থেকেও লুকোতে চেয়েছিলাম !

রাজসভায় যান না...রাজকার্য সমস্তই মন্ত্রী প্রশ়িলন করেন...
দুঃস্থিরে একমাত্র কাজ হলো, ছবি আঁকা...নিভৃতে কুঞ্জ-ভবনে
শকুন্তলার ছবি আঁকেন...তাইতেই তন্ময় হয়ে থাকেন...

নিপুণিকা নিঃশব্দে তাঁকে সাহায্য করে...রঙ গুলে দিয়ে, তুলি
পরিষ্কার ক'রে...

বারবার ক'রে আঁকেন, মুছে ফেলেন, আবার আঁকেন...

তন্ময় হয়ে পটে শকুন্তলার অগাঠিত মৃত্তির দিকে চেয়ে ঘৃতকষ্টে
বলেন, আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো, শকুন্তলা !

স্থির দাঢ়িয়ে নিপুণিকা দেখে, দুঃস্থিরে দু'চোখ দিয়ে ধারাশ্রাতে
অঙ্গ গড়িয়ে পড়ছে...

ক্রমশঃ ফুটে ওঠে মৃত্তি...

পদ্মপত্রে নখ দিয়ে শকুন্তলা চিঠি লিখছে, দু'পাশ থেকে
প্রিয়মন্দা-অনন্ত্যা দেখছে...

নিপুণিকা বিস্ময়ে চেয়ে দেখে...

শিল্পী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, অসমাপ্ত পট...এখনো বহু জিনিস
আঁকা বাকি আছে...এখনো আসেনি মালিনী...মালিনীর তীরে
হংসমিথুন...মৃগশিশু...নব-মুকুলিত নব-মল্লিকা...বনজ্যোৎস্না...

আবার অঙ্গ-বাঞ্চা ছেয়ে আসে দুঃস্থিরে দু'চোখে...

ପ୍ରଥମକଲ୍ୟା

କୁଠିତଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଷ୍ଟର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରେନ...

—ଆପନାକେ ଉତ୍ୟକ୍ତ କରତାମ ନା, କିନ୍ତୁ ଏମନ ଏକଟା ରାଜ-କାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହରେଛେ, ଯା ଆମାର ଅଧିକାରେର ବାହିରେ...ଆପନାର ସମ୍ମତି ଓ ଉପଦେଶ ଦରକାର ।

—କି ବ୍ୟାପାର ? ଦୁଇଷ୍ଟ ଜିଜ୍ଞାସା କରେନ ।

—ଆମାଦେର ରାଜ୍ୟ ଧନମିତ୍ର ନାମେ ଏକ ଅତି-ସନ୍ତୋଷିତ ବଣିକ ଛିଲେନ...ବିଦେଶେ ବାଣିଜ୍ୟ କରତେ ଗିଯେ ଅକ୍ଷ୍ୟାଂ ଜଳ-ପଥେ ନୌକୋ-ଡୁବିତେ ତିନି ଦେହତ୍ୟାଗ କରେଛେନ...

—ତାତେ ଆମି କି କରତେ ପାରି ବଲୁନ ?

—ତାର ଅଗାଧ ସମ୍ପଦି...

—ତାତେ ଆମାର କି ?

—ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ-ହୀନ ଭାବେ ମାରା ଯାଓଯାଇ ସେ-ସବ ସମ୍ପଦି ଆହିନ ଅଛୁମାରେ ରାଜାର ପ୍ରାପନ୍ୟ ।

ଦୁଇଷ୍ଟ ଜିଜ୍ଞାସା କରେନ, କେନ, ବଣିକେର ପୁତ୍ର ନେଇ ?

ମନ୍ତ୍ରୀ ବଲେନ, ତିନି ନିଃସଂତ୍ବାନ ।

ବୈଶାଖେର ଅକ୍ଷ୍ୟାଂ ଘର୍ଡେର ମତନ ନିଃସଂତ୍ବାନ ଦୁଇଷ୍ଟର ଅନ୍ତର ଆଲୋଡ଼ିତ ହେଁ ଓଠେ !

ମନ୍ତ୍ରୀକେ ବଲେନ, ଆପନି ଭାଲୋ କ'ରେ ଅଛୁମକାନ କରେଛେନ ତୋ ?
ତାର କୋନୋ ପତ୍ନୀର ଗର୍ଭେ କୋନୋ ସଂତାନ ହୁଇନି ?

ମନ୍ତ୍ରୀ ବଲେନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଯାବାର ପୂର୍ବେ ତିନି ଏକଟି ବିବାହ କରେନ...
ସେଇ ପତ୍ନୀ ଶୁନଲାମ ଗର୍ଭବତୀ...

ଶ୍ରିରକଟେ ଦୁଇଷ୍ଟ ଆଦେଶ ଦେନ, ସେଇ ଗର୍ଭେ ଯଦି ପୁତ୍ରସଂତ୍ବାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ
କରେ, ସେଇ ପୁତ୍ର ହବେ ଧନପତିର ସମ୍ପଦିର ଅଧିକାରୀ...ତତକ୍ଷଣ ଆପନି
ଅପେକ୍ଷା କ'ରେ ଥାକୁନ !

ଅଭିବାଦନ କ'ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚଲେ ଯାନ...

পঞ্চকন্যা

দূরের দিকে চেয়ে দুঃস্থ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন...

তিনিও নিঃসন্তান...

তিনিও...

দেবরাজ ইন্দ্রের দৃতরূপে এসেছে মাতলি...

— দুরস্থ কালনেমির সন্তানেরা খায়িদের যজ্ঞ-কার্য পঞ্চ করবার
জন্যে দলবদ্ধ হয়েছে... তাই দেবরাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন...
তাদের ঝংস করে দেবরাজকে নিশ্চিন্ত করুন !

তুঃস্থ নিঃসংশয়কষ্টে বললেন, তাঁর এ আদেশ আমি মাথা পেতে
নিলাম... দৈত্যদের ঝংস না ক'রে আমি ফিরবো না ! দেবরাজকে
বলবেন, তাঁর আশীর্বাদ থেকে যেন বঞ্চিত না হই !

আজ দুঃস্থের বড় প্রয়োজন দেবতার আশীর্বাদ !

বড় শুভক্ষণে এসেছে ইন্দ্রের আবেদন...

অবসাদের অপঘাত থেকে জেগে গুঠেন তুঃস্থ... অর্জন করতে
হবে অধি-দেবতার আশীর্বাদ...

নিস্তুর প্রাসাদ-তোরণে বেজে গুঠে রণ-ভেরী...

আবার তপোবনে

দৈত্যদের পরাজিত ক'রে দুঃস্থ ফিরে আসেন...

হরি-চন্দন-মাখা নিজের গলার মন্দার-মালা খুলে তুঃস্থের
গলায় দেবরাজ ইন্দ্র পরিয়ে দেন...

মাতলিকে আদেশ করেন, মর্ণ্যলোকে দুঃস্থকে পৌঁছিয়ে
দিতে...

মেঘ-মন্দিত আকাশ-পথে দ্রুত এগিয়ে চলে মাতলির রথ...

পঞ্চকল্পা

মেষস্তর থেকে নামতেই নীচে চোখে পড়ে, সমুজ্জ-মেখলা সবুজ
পৃথিবী...

আবার সেই পৃথিবী...শকুন্তলা-হীন পৃথিবী...পুষ্পহীন, ফলহীন,
সৃতির কণ্ঠকে-ভরা পৃথিবী...

রথ নেমে আসে ভূমগুলের কাছে...

হৃষ্টস্তর নজরে পড়ে নীচে শুভ তৃতীন-প্রাঞ্চের শেষে জ্যোতির্ময়
সবুজ ভূ-খণ্ড...সবুজ রঞ্জের মতন যেন জ্বলছে...

কৌতুহলে হৃষ্টস্তর জিজ্ঞাসা করেন, মাতলি, নীচে এই যে সবুজ
ভূ-খণ্ড দেখা যাচ্ছে...

মাতলি বলে, দেবৰ্ষি মারীচের আশ্রম...

—দেখছো, ভূমি থেকে যেন একটা জ্যোতির বাস্প উঠছে ?

মাতলি বলে, বড় পুণ্যস্থান...কথিত আছে, এই আশ্রমের
তপোবনে যে-কেউ সাধনায় বসলে সিদ্ধিলাভ করে !

আবার সেই তপোবন...

কি যেন হৰ্বারভাবে আকর্ষণ করে...হৃষ্টস্তর বলেন, মাতলি,
চলো এই পুণ্যভূমিতেই নামি...দেবৰ্ষিকে একবার প্রণাম ক'রে
যাবো...

মাতলি তপোবন-প্রান্তে রথ নামায়...

রথ থেকে নামতেই হৃষ্টস্তরে চেতনায় এসে লাগে, তপোবনের
স্বাস...সেই যজ্ঞ-হবির গন্ধে স্নিগ্ধ বাতাস...তপোবন-তরুর সেই
যজ্ঞ-ধূমাঞ্জন-মাথা বিচ্ছি শ্যামলিমা...

পাশ দিয়ে নির্ভয়ে সেই চলে যায় কৃষ্ণসার মৃগশিশু...

মাতলি বলে, আপনি ঘুরে তপোবন-শোভা দেখুন, আমি
আশ্রমে গিয়ে খাবিদের খবর দি !

হৃষ্টস্তর তৃণ-পথ ধ'রে সন্তর্পণে এগিয়ে চলেন...পুষ্পিত তরুণ

পঞ্চকন্যা

তপোবন-তরুদের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে কখন মন চলে
যায় আর-এক তপোবনের তৃণ-পথে...মালিনীর তীরে...

সহসা চমকে ওঠেন...কাছেই বনের আড়াল থেকে ভেসে আসে
স্নিঘ নারী-কঠ...

তুম্ভন্ত সচকিত হয়ে ওঠেন, সত্যিই কি স্বপ্নের সন্মোহনে তিনি
চলে গিয়েছেন মালিনীর তীরে ?

এগিয়ে গিয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়ান...

ঠিক এমনি আর-একদিন আর-এক তপোবনে এমনি গাছের
আড়াল থেকে...

আবার বাতাসে আসে সেই কঠস্বর...আরো কাছে...কান
পেতে শুনতে চেষ্টা করেন...কে যেন তুরন্ত শিশুকে ভৎসনা করছে,

—ওমা...এতটুকু ভয় নেই.. এখন থেকেই এইরকম...ছাড়...
ছাড়...বলছি !

তুম্ভন্ত গাছের আড়াল থেকে গলা বাঢ়িয়ে দেখেন,—

বিশ্঵াকর ব্যাপার...দেবকান্তি মহাবলিষ্ঠ এক শিশু সিংহ-
শাবকের ওপর ব'সে তার কেশর ধ'রে টানছে ! আর এক তপস্বিনী
কিছুতেই তাকে ছাড়াতে পারছে না !

তপস্বিনী ভীতকঠে বলে, তুমি বুঝছো না, সিংহী যদি দেখতে
পায় তার বাচ্চাকে তুমি ঐ রকম করছো, তোমাকে আস্ত রাখবে না !

নির্বিকার শিশু হেসে ওঠে...

তু-হাত দিয়ে সিংহ-শিশুর মুখ ফাঁক করবার চেষ্টা করে...
অগাঠিত শিশুর ভাষায় বলে, জিম্ম সিংহ, দস্তাইং দে গণইশ্বং ! মুখ
হাঁ কর বলছি, আমি তোর দাঁত গুনে দেখবো !

তুম্ভন্ত বিহুল হয়ে যান...

কে এ শিশু ? এই বয়সে সিংহ-শিশু নিয়ে খেলা করছে !

পঞ্চকন্যা

তপস্বিনী বিব্রত হয়ে ওঠে,—ঝুঁঝিরা বুঝে-সুজেই তোর নাম
সর্ব-দমন রেখেছিলেন...ছাড় বলছি...ভয় করে না একটুও ?

তপস্বিনীকে ব্যঙ্গ ক'রে শিশু বলে, ওর বাবারে ! বড় ভয়
করছে !

সঙ্গে সঙ্গে সিংহ-শিশুর কেশের দু-হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে
তার মাথাটা টেনে তুলতে চেষ্টা করে...

সিংহ-শিশু গর্জন ক'রে ওঠে...

তুম্ভন্ত গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে ঘান...

তুম্ভন্তকে দেখে তপস্বিনী অকুণ্ঠভাবে বলে, একবার এদিকে
আসুন না...আমি কিছুতেই পারছি না...তুরন্ত ছেলে আমার কথা
কানেই তুলছে না...ওর হাত থেকে সিংহ-শিশুটিকে বাঁচান !

শিশুর কাছে গিয়ে তুম্ভন্ত কপট-গান্তৌর্যে বলেন, ওকে ছেড়ে
দাও ! তুমি ঝুঁঝির কুমার...জীব-জন্মকে নির্যাতন করা কোথা থেকে
শিখলে ?

সিংহ-শাবকের পিঠে তেমনি ব'সে নির্ভীক শিশু ঘাড় উচু ক'রে
তুম্ভন্তের দিকে চেয়ে থাকে...

তপস্বিনী বলে, ও ঝুঁঝির কুমার নয় !

তুম্ভন্তের বুক কেঁপে ওঠে...

প্রশ্ন করতে সাহস হয় না...

তবুও জিজ্ঞাসা করেন, তাহ'লে এ শিশু...কোন্ বংশের ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তপস্বিনী বলে, এই শিশু পুরু-বংশের সন্তান !

তুম্ভন্ত যেন আপনার মনে বলেন, তাই...তাই হবে...ক্ষত্রিয়-
বংশের সন্তান না হ'লে—পুরু-বংশের কেউ কেউ সংসার ছেড়ে
গুনেছি অরণ্যবাস করছেন...শিশুর মা নিশ্চয়ই জীবিত ?

—হ্যাঁ...

—তিনি কার পঞ্জী ?

—তিনি ধাঁর পঞ্জী, তাঁর নাম উচ্চারণ করতেও আমাদের ঘৃণা হয়!

—কেন ?

—বিনাদোষে অকারণে যে তার ধর্মপঞ্জীকে অস্বীকার করে,
কে তার নাম উচ্চারণ করবে ?

দৈত্য-বিজয়ী দুঃস্থির সারা দেহ কেঁপে ওঠে...আর প্রশ্ন করতে
সাহস হয় না...

তপস্বিনী শিশুকে ভোলাবার জন্যে গাছের ডালে রঙিন পাখীদের
দেখিয়ে বলে, এই ঢাখ...কি সুন্দর শঙ্কুন্ত-লাবণ্য !

শিশু অন্যমনস্কভাবে সিংহ-শাবককে ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, কৈ
আমার মা !

দুঃস্থি আর থাকতে পারেন না, দু-হাত প্রসারিত ক'রে আকুল-
কঢ়ে শিশুকে ডাকেন, এসো...এসো...আমার কাছে !

শিশু তিক্তকঢ়ে বলে, কেন যাবো তোমার কাছে ?

কম্পিতকঢ়ে দুঃস্থি বলেন, আমি তোমাকে তোমার বাবার কাছ
নিয়ে যাবো !

শিশু ঘাড় সোজা ক'রে আপাদমস্তক দুঃস্থিকে দেখে নিয়ে বলে,
আমার বাবা কে জানেন ?

—বলো, বলো কে তোমার বাবা !

প্রচণ্ড-গৌরবে দীপ্তি হয়ে ওঠে শিশুর মুখ...

—আমার বাবা পুরু-রাজ দুঃস্থি ! চেনো তাঁকে ?

সহসা সমস্ত তপোবন কেঁপে ওঠে একটি শব্দে...কে ডাকে,
সর্ববিদ্মন !

দুঃস্থি চেয়ে দেখেন, সামনে দাঁড়িয়ে পরিধ্বসরবসনা তপস্তাদ্র-
কাণ্ঠি একবেণীধরা শঙ্কুন্তলা...

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠ

ଦୁଇନ୍ତ କୋନୋ କଥା ବଲିଲେ ପାରେନ ନା...

ଧୀରେ ସାମନେ ଏସେ ଶକୁନ୍ତଳା ଅଭିବାଦନ କରେ, ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରେର ଜୟ ହୋକ !

ଅଶ୍ରୁରଙ୍ଗକଟେ ଦୁଇନ୍ତ ବଲେନ, ଜୟ ଆମାର ନଯ ଶକୁନ୍ତଳା, ତୋମାରିଇ ଜୟ...

ବିଶ୍ୱାସେ ସର୍ବଦମନ ଜନନୀର ଦିକେ ଚେଯେ ବଲେନ, କେ ଇନି ?

ମୁଁ ନତ କ'ରେ ଶକୁନ୍ତଳା ବଲେ, ତୋମାର ଅନୃଷ୍ଟକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୋ ବଂସ !

ତୁ ମିତି ନତଜାହୁ ହେଁ ଦୁଇନ୍ତ ବଲେନ, ଆମାକେ କ୍ଷମା କରୋ ଶକୁନ୍ତଳା !

ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର...ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର...ଏକି କରୋ ତୁ ମି...

ଦୁ-ହାତ ଦିଯେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଇନ୍ତକେ ତୁଲେ ଧରେ ।

—ଏହି ମେହି ଆଂଟି...ତୁ ମି ଚଲେ ଯାଓୟାର ପରଇ ଆମାର ହାତେ ଆସେ...ମେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥେକେ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...ତୁ ମି ଜାନୋ ନା ଶକୁନ୍ତଳା, କି କଠିନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଆମି କରେଛି...ଦେଖି ତୋମାର ଆଙ୍ଗୁଳ ..

ଶକୁନ୍ତଳାର ଆଙ୍ଗୁଲେ ପରିଯେ ଦେବାର ଜଣେ ଦୁଇନ୍ତ ନିଜେର ଆଙ୍ଗୁଲ ଥେକେ ଆଂଟି ଖୁଲୁତେ ଯେତେଇ ଶକୁନ୍ତଳା ଆଙ୍ଗୁଲ ଚେପେ ଧରେ, ନା ଥାକ୍, ଓ ଆଂଟି ତୋମାର ଆଙ୍ଗୁଲେଇ ଥାକ୍...ଓକେ ଆମି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନା... ସର୍ବଦମନ, ତୋମାର ପିତାକେ ପ୍ରଣାମ କରୋ !

ପାଯେ ନତ ହବାର ଆଗେଇ ଦୁଇନ୍ତ ଦୈତ୍ୟଜୟୀ ଦୁଇ ବାହୁ ଦିଯେ ଶିଶୁକେ ବୁକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେନ ।

- লঞ্চীবাঙ্গ

হে রাণী লঞ্চীবাঙ্গ, আজ বাংলাদেশে একজন বাঙালী-সাহিত্যিক
বাংলার জনসাধারণের কাছে তোমার জীবনের গল্প বলছে।

এই স্মৃতিগে, তার অন্তরের প্রণাম সে তোমাকে জানাচ্ছে।
তোমার মত মেয়ে একদিন যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিল,
ভারতবাসীরূপে সে-কথা ভাবতে অন্তর আনন্দে ও গর্বে ভ'রে
ওঠে।

নারী-স্বাধীনতার কথা যুরোপের কাছ থেকে আজ আমাদের
শিখিতে হবে, এ যে কত বড় ভুল ধারণা, তোমার জীবনই তার
শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কোনোদিন আমরা নারীকে অপমান করিনি,
কোনোদিন আমরা নারীকে ছেট ক'রে দেখিনি, নইলে তোমার
মতন মেয়ে এ-দেশে জন্মাতে পারতো না। অবশ্য অভ্যন্ত দুঃখের
সঙ্গে বলতে হয়, এতবড় দেশ, এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে সে
গিয়েছে, তার মধ্যে সবাই যে সব সময় নারীকে সম্মান দেখাতে
পেরেছে তা নয়, নারীকে যথেষ্ট দুঃখ, যথেষ্ট যন্ত্রণা আমরা
দিয়েছি, সে আমাদের সাময়িক ভুল, সে আমাদের ক্রটি। কিন্তু
সেটা আমাদের স্বভাব নয়, আমাদের স্বভাবের সাময়িক বিকার।
সে-বিকার যে আমাদের ঘটেনি, এ কথা আমি অস্ফীকার করতে
চাই না। তার জন্যে আমরা লজ্জিত। ভুল করেছি, সংশোধন
করবো। কিন্তু একথা ঠিক নয় যে, যুরোপ আমাদের শিখিয়েছে,
যুরোপ আমাদের শেখাবে নারীকে সম্মান দিতে। আমার প্রতিবাদ

পঞ্চকন্যা

সেইখানেই। নারী কি ক'রে তার সম্মান আদায় করবে, তার জন্যে আমাদের নারীদের যুরোপের দিকে চেয়ে থাকবার দরকার নেই। আমাদের ইতিহাসের মধ্যেই আছে নারীর সেই সম্মানের আসন। সেই কথাই হে রাণী লক্ষ্মীবান্তি, হে বাঁসীর রাণী, তোমার জীবনে আমরা দেখতে পাই।

যখন তোমার বয়স অতি তরুণ, তখন তুমি তোমার স্বামীকে হারিয়েছো। সেই তরুণ-বয়সে তুমি একা যেভাবে তোমার জীবন যাপন করেছো, জগতের নারী তা অল্পকরণ করতে পারে। সে-প্রেম, সে-নির্ভীক, সে-ত্যাগ যুরোপ জানে না।

সারা দেশ যখন দাবানলে জলছে...ভয়ে, ছশ্চিষ্টায়, ছর্ভোগে যখন মাঝুষ অস্থির, সেইসময় তুমি ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছো, তাদের বক্তু, ভগ্নী, জননী এবং নেতাজুপে তাদের পরিচালনা করেছো। আজ স্বাধীন-ভারতের জনসাধারণ তোমার সেই অনন্যসাধারণ স্বদেশ-প্রেমের কাছে শ্রদ্ধাঙ্গলি দিচ্ছে।

তুমি নারী হয়ে, প্রয়োজনের বশে পুরুষের বর্ণ পরেছো, পুরুষ-সেনিকের পাশে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করেছো, যুরোপের রণ-শিক্ষায় স্থুশিক্ষিত সেনাপতিদের বিকল্পে বারবার নিজের বিজয়-পতাকা তুলে ধরেছো, পুরুষ-বীরেরা যখন হতাশ হয়ে গিয়েছে তখন তুমি তাদের প্রাণে নতুন উৎসাহ এনে দিয়েছো...মন্ত্রণাকঙ্কে, রাজনীতিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শিবিরে তুমি যে চরিত্র-মহিমা দেখিয়ে গিয়েছো, জগতের ইতিহাসে ফরাসী-নারী 'জন অফ আর্ক' ছাড়া তার তুলনা নেই।

সর্বশেষে, এই আমাদের সকলের জননী, ভারতবর্ষ, তার মুক্তির জন্যে তুমি তোমার সর্বস্ব দিয়ে গিয়েছো, তার মুক্তির জন্যে অকৃষ্ণ চিত্তে তুমি প্রাণ-বিসর্জন ক'রে গিয়েছো, আজ মুক্ত-ভারতের

জনসাধারণ তাই তোমাকে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে, হে ভারত-
ছহিতা, মুক্তি-ভারতের জনসাধারণের পুষ্পাঙ্গলি এহণ করো !

*

*

*

দিল্লীর সিংহাসনে তখন নামমাত্র ব'সে আছেন মুঘল-রাজবংশের
প্রতিনিধি—বাহাদুরশাহ।

মুঘলদের ভারত-জোড়া সে-রাজত্ব আর নেই। সৈয়-সামন্ত যা
আছে, তা খুবই সামান্য।

ইংরেজ, ফরাসী আর ওলন্দাজরা একটু একটু ক'রে ভারতবর্ষ
দখল ক'রে নিচ্ছে। তাদের বাধা দেবার মতন শক্তি বাহাদুরশাহ—
এর নেই।

মুঘল-সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে চারদিকে সব ছোট ছোট টুকরো
টুকরো রাজ্য গ'ড়ে উঠেছে। তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ছোট
গুলীর মধ্যে স্বাধীন ব'লে নিজেদের ঘোষণা করে এবং সুবিধা
পেলেই পরম্পরের সঙ্গে পরম্পর লড়াই করে। কেউ কারুর ভালো
দেখতে পারে না। যার যা ছোট গুলী, তার বাইরে বৃহত্তর দেশকে
তারা দেখতে পায় না।

ইংরেজরা এসে দেখলো, এই সুযোগ। রামের সঙ্গে মিশে
শ্যামকে তারা হারিয়ে দেয়, আবার যত্র সঙ্গে মিশে রামকে উদ্ব্যস্ত
ক'রে তোলে। এইভাবে একজনের সঙ্গে আর-একজনকে লাগিয়ে
জ'জনকেই দুর্বল ক'রে ফেলে এবং এবং তার স্বয়েগে এত বড়
দেশটা ক্রমশঃ গ্রাস ক'রে নেয়।

বাধা দেবার শেষ চেষ্টা করেছিল, মারাঠারা। কিন্তু তখন
তাদেরও কেউ সাহায্য করলো না। মুঘলদের সঙ্গে লড়াই করতে
করতে তারাও ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়লো। তারপর নিজেদের মধ্যে

পঞ্চকন্যা

বগড়া-বাঁটিতে তারা আরো দুর্বল হয়ে এলো। তখন মারাঠাদের শেষ পেশওয়া বাজীরাও, অসহায় অবস্থায় রাজ্য ছেড়ে দিয়ে উত্তর-ভারতে ‘বিঠুর’ ব'লে এক জায়গায় এসে বসবাস করতে লাগলেন। ইংরেজদের অনুগ্রহে সেই বিঠুরে বাজীরাও নিজের যা ধন-দৌলত ছিল তাই নিয়ে নকল রাজা সেজে জীবন নির্বাহ করতে লাগলেন। মাস গেলে কোম্পানীর কাছ থেকে আসে পেন্সন...থাক ধূলোয় প'ড়ে ভাগওয়া বাণও! কাজ কি হঙ্গামায়!

বাজীরাও-এর দেখাদেখি অনেক সন্তুষ্ট মারাঠা সেই সময় নিজেদের দেশ ত্যাগ ক'রে বাজীরাও-এর সঙ্গে চলে আসেন। এইভাবে মাধবরাও ভাট আর তাঁর শ্রী গঙ্গাবাঙ্গীও দেশ ছেড়ে চলে আসেন। বাজীরাও, মাধবরাও-কে তাঁর দরবারে একটা কাজও দিলেন।

বাজীরাও-এর কোনো ছেলেপুলে ছিল না। সেইজন্যে তাঁর মনে বড় অশাস্ত্র ছিল। হঠাৎ একদিন তাঁর নজরে পড়লো, একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন, শিশুটি তাঁর কর্মচারী মাধবরাও-এর ছেলে। ছেলেটিকে দেখে তাঁর বড় ভালো লেগে গেল। দেখলেন ছেলেটির হাবভাবও চমৎকার। তিনি মাধবরাও-কে ডেকে বললেন, এই ছেলেটিকে যদি তারা দিয়ে দেন, তিনি দন্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। পুত্রের সেই সৌভাগ্যের সন্তানায় মাধবরাও রাজী হলেন। যথাকালে যাগ-যজ্ঞ ক'রে বাজীরাও সেই ছেলেটিকে তাঁর নিজের ছেলে ব'লে গ্রহণ করলেন। ছেলেটির নাম রাখলেন, নানাসাহেব। এইভাবে সেদিন মারাঠার দূর-গ্রামের এক সামাজ্য গৃহস্থের ছেলে ভারত-ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে পড়লো। বাজীরাও-এর পর ‘পেশওয়ার’-উপাধি নানা-সাহেব পান। কিন্তু তার জন্যে নয়, এই নানাসাহেবই ছিলেন

সিপাহী-বিপ্লবের আসল জনক। তাঁর নামে একদিন ইংরেজরা কঁপতো। কিন্তু সে আর এক গল্প।

এই নানাসাহেব যখন বিঠুরে পেশওয়ার-প্রাসাদে একা খেলা করতেন, সেইসময় সৌভাগ্যবশত তাঁর খেলার সাথী এবং সঙ্গীরূপে একটি ছোট্ট মেয়েকে পেলেন।

এই মেয়েটির বাবা ও মারাঠা-দেশ ছেড়ে কাশীতে এসে বসবাস করছিলেন। তাঁর নাম ছিল মোরাপন্ত তাহে। মোরাপন্ত আর তাঁর স্ত্রী ভাগিরথীবাঙ্গি এই ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে তাঁদের দরিদ্র-সংসার কোনোরকমে চালাতেন। মেয়েটির নাম তাঁরা রেখেছিলেন, মাঝুবাঙ্গি।

ক্রমশঃ অবস্থা খারাপ হয়ে আসাতে মোরাপন্ত ঠিক করলেন, তিনি বিঠুরে পেশওয়া বাজীরাও-এর কাছে সাহায্য চাইতে যাবেন। বিঠুরে এসে পেশওয়ার সঙ্গে দেখা করতে, বাজীরাও তাঁর ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর প্রাসাদের এক অংশেই তাঁদের থাকতে দিলেন। ছোট্ট মাঝুবাঙ্গিকে দেখে তাঁর এত ভালো লেগে গেল যে, তিনি সেই মেয়েটির শিক্ষা-দীক্ষার ভার নিজেই নিলেন। মাঝুবাঙ্গি পেশওয়ার-প্রাসাদে নানাসাহেবের সঙ্গে একসঙ্গে খেলাধূলা, পড়াশুনা করতে লাগলো। মেয়েটির অপূর্ব সুন্দর চেহারা আর তাঁর ছষ্টুমি দেখে প্রাসাদের সকলে তাকে ‘ছবেলী’ বলে ডাকতো। ছবেলী মানে, ময়না। এইভাবে দু'দিক থেকে দুটি শিশু সাধারণ জীবনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও, ভাগ্যগুণে একেবারে পেশওয়ার-প্রাসাদে এসে স্থান পেলো এবং সেখান থেকে তাঁরা দু'জনেই পরে ভারতের ইতিহাসে অমর-আসন দখল ক'রে নিলো। এই মেয়েটিই ইতিহাসে—বাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঙ্গি নামে পরিচিত।

পঞ্চকন্তা

* * *

ছবেলীর দুরস্তপনায় বিঠুরের প্রাসাদে সবাই অস্থির। একরত্নি
মেয়ে, কিন্তু একদণ্ড স্থির নেই। নানাসাহেব যা করবে, তাকেও
তাই করতে হবে।

নানা, পশ্চিতের কাছে পড়তে বসে, মাঝ একমনে শোনে।
অঙ্গের পর পশ্চে পশ্চিতকে অস্থির ক'রে তোলে। পড়ার পর,
খেলার মাঠে, সে-ও ছুটবে নানার সঙ্গে।

তলোয়ার নিয়ে নানা ওস্তাদের কাছে তলোয়ার-খেলা শেখে,
ছবেলীও একটা ছোট্ট তলোয়ার নিয়ে তাকে অনুকরণ করে।
ওস্তাদকে ছাড়ে না, তাকেও তলোয়ার-খেলা শেখাতে হবে। মারাঠার
মেয়ে সে। দেখতে দেখতে, কি আশ্চর্য! সে সমানে তলোয়ার
নিয়ে নানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। তার ক্ষিপ্রতায় নানা
অবাক হয়ে যায়।

নানা হাতির ওপর চ'ড়ে হাতি চালাতে শিখেছে। ছবেলীও
হাতি চালাবে। অগত্যা তাকে হাওদায় তুলে নিতে হয়।

সবচেয়ে বিপদ হয়, ঘোড়া চালাবার সময়। এটুকু মেয়ে, ঘোড়া
দেখলে যেন আনন্দে নেচে ওঠে। লোকের ওপর ভর ক'রে ঘোড়ার
পিঠে চড়তে হয়, কিন্তু একবার ঘোড়ার পিঠে চড়ার পর, আর
কারুর সাহায্য সে চায় না। জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। দুরস্ত
পশ্চ সেই শিশুর ইঙ্গিতে থামে, হাঁটে, ছোটে, নেচে নেচে চলে।
দরবারের লোকেরা অবাক হয়ে দেখে সেই ছোট মেয়ের ঘোড়া
চালানোর কায়দা।

মাঝবাটি-এর বয়স তখন মাত্র সাত।

শিবাজী যে জাতে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে সেই জাতের মেয়ে...
তার রক্তে আছে—যুদ্ধের নেশন।

পঞ্চকন্যা

* * *

প্রথা। বাল্যবিবাহ।

আট বছরের মেয়ে মাছুবাঙ্গি, একদিন মহা-সমাবেশে হয়ে গেল
তার বিয়ে।

বাঁসীর শাসক মহারাজা গঙ্গাধর রাও বাবাসাহেব সেই
বালিকাকে বিবাহ ক'রে নিয়ে এলেন বাঁসীতে।

বিয়ের সময় পুরোহিত যখন স্বামীর কাপড়ের সঙ্গে শ্রীর আঁচল
গ্রন্থি দিয়ে বাঁধছিলেন, তখন মেয়ে হঠাৎ ব'লে উঠলো, ‘খুব জোরে
গেরো দিন।’

হায়, তখন কে জানতো, ত'দিন পরেই এই গেরো খুলে যাবে!

* * *

বিঠুরের ছবেলী, বাঁসীতে এসে হলেন—রাণী লক্ষ্মীবাঙ্গি। লক্ষ্মীর
মতন তাঁর স্বন্দর মুখ দেখে রাজ-পুরোহিত নামকরণ করলেন,
মহারাণী লক্ষ্মীবাঙ্গি।

ক্রমশঃ বয়স বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীবাঙ্গি সকলের প্রিয় হয়ে
উঠলেন। কিন্তু মহারাজার তখন বয়স অনেক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর
প্রথম শ্রীর মৃত্যুর পর তিনি লক্ষ্মীবাঙ্গিকে বিবাহ করেন। তাঁর
কোন ছেলে-মেয়ে হয়নি। লক্ষ্মীবাঙ্গি-এরও কোনো সন্তান হলো না
দেখে, তিনি শির করলেন, একটি ছেলেকে তিনি ‘দক্ষ’ নেবেন।
দেখে-শুনে একটি স্বন্দর স্বলক্ষণ শিশুকে তিনি যথারীতি দত্তক
নিলেন এবং তার নাম রাখলেন, দামোদর। দামোদরকে লক্ষ্মীবাঙ্গি
নিজের ছেলের মতন লালন-পালন করতে লাগলেন। কিন্তু মহা-
রাজা আর বেশীদিন বেঁচে রইলেন না। লক্ষ্মীবাঙ্গি-এর বয়স তখন

পঞ্চকন্যা

মাত্র উনিশ, সেইসময় তিনি বিধবা হলেন। সমস্ত রাজ্যের ভার তাঁর ওপর এসে পড়লো।

স্বামীর মৃত্যুতে সেই অল্লবয়সে বিধবা হয়ে তিনি মনে নিদানুণ শোক পেলেন।

স্থির করলেন, পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করবেন।

কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না যে, ভাগ্য আর-একদিকে তাঁকে অকর্ষণ করছে।

দেবতার পায়ে তিনি জীবন উৎসর্গ করবেন, এ-সন্দেশ তাঁর ঠিকই রইলো। কিন্তু সে-দেবতা তাঁর গৃহ দেবতা মহালক্ষ্মী নয়, সে-দেবতা হলো—দেশ-জননী ! ভারতের অন্তরবাসিনী মহালক্ষ্মী।

*

*

*

দেয়ালের গায়ে নতুন একটা ছবি টাঙানো হচ্ছে। ছবিটির নাম, ‘ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য’।

ছবিটাকে ঠিক করিয়ে বসাবার জন্যে, ছবির তলায় দু’ধার থেকে দুটি শক্ত পেরেক গাঁথা হলো...একটি পেরেকের নাম লর্ড ক্লাইভ, আর-একটি পেরেকের নাম লর্ড ডালহাউসী।

ইংরেজ-ঐতিহাসিকদের মতে, ইংলণ্ডের দুটি শ্রেষ্ঠ সন্তান, জগতের দুটি শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক।

একজন বড়বন্দু ক’রে যে-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করলো, আর-একজন নগ তলোয়ার নিয়ে এসে তাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করলো।

ভারতবর্ষের ইতিহাস যখন নতুন ক’রে লেখা হবে, তখন ভারতবর্ষের লাঞ্ছনিকারীদের সকলের আগে এই দুটি নাম লেখা হবে। এই দুটি নামের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থানের গৌরব লাভ করবে দ্বিতীয় লোকটি...লর্ড ডালহাউসী।

ক্লাইভ যে কাজ মাত্র আরম্ভ করেন, লর্ড ডালহাউসী তাকে
সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ ক'রে ঘান। ছলে, বলে, কোশলে
হিমালয় থেকে কণ্ঠাকুমারিকা পর্যন্ত তিনি বৃটিশ-শাসনকে
সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে বিদ্যায় গ্রহণ করেন।

যেদিন তিনি রাজ-প্রতিনিধিত্বাপে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন,
সেদিন তিনি সগর্বে বলিয়াছিলেন, I will level the land of
Hindusthan—হিন্দুস্থানকে আমি সমতল ক'রে দিয়ে যাবো !

তাঁর এই দস্ত তিনি অক্ষরে অক্ষরে সফল করেছিলেন।

* * *

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্মেই ডালহাউসী ভারতবর্ষে আসেন
এবং এসে দেখলেন, তখনও পর্যন্ত কোনো কোনো অঞ্চলে দেশী-
রাজাৱা প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করছেন। চারিদিকের সমতল-
ক্ষেত্রের মধ্যে তাদের ছু-একটা মাথা তখন উচু হয়ে দেখা যাচ্ছে।
ডালহাউসীৰ চোখে সেটা বড় বিসদৃশ লাগলো। যেখানে পারলেন,
যেখানে পিঠ চাপড়ে; যেখানে তা সন্তুষ্ট হলো না, সেখানে
তলোয়ার দিয়ে একধার থেকে তিনি সব সমতল ক'রে যেতে
লাগলেন। তলোয়ার চালাতে তিনি বিনুমাত্র দ্বিধা করতেন না,
কিন্তু তলোয়ারের চেয়েও মারাত্মক এক অস্ত্র তিনি তৈরী করলেন.
এক অপূর্ব আইন। যদি কোনো দেশী-রাজা হৰ্ভাগ্যক্রমে পুত্রহীন
অবস্থায় মারা ঘান, তাহ'লে সে-রাজ্য পরিচালনা করবার ভার
আপনা-থেকে সদাশয় বৃটিশ গভর্নমেন্টের হাতে চলে আসবে।

এই অপূর্ব আইনের তলোয়ার দিয়ে লর্ড ডালহাউসী অবশিষ্ট
দেশী-রাজ্যগুলিকে সমতল করতে লাগলেন।

বিধবা রাণী লক্ষ্মীবান্তি ভীত হয়ে উঠলেন। তাঁর স্বামী পুত্রহীন
অবস্থায় মারা গিয়েছেন, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রমতে তাঁরা দামোদরকে

পঞ্চকন্যা

দন্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। ধর্ম্মত, আয়ত এখন বাঁসীর রাজা হলো, দামোদর। দামোদর নাবালক ব'লে, তার অভিভাবকরূপে তার জননীই রাণী-মা রূপে রাজ্যচালনা করছেন।

কিন্তু লর্ড ডালহার্টসীর দৃত এসে রাণী লক্ষ্মীবাঙ্গীকে জানিয়ে দিলো, তা হবে না। সমদর্শী বৃটিশ-সাম্রাজ্যের আইন অঙ্গুসারে বাঁসী এখন ইংরেজ-শাসকের দ্বারা শাসিত হবে।

সঙ্গে সঙ্গে এলো বৃটিশ-সেনাদল। বাঁসীর ছর্গ দখল ক'রে সেখানে তারা উড়িয়ে দিলো, যুনিয়ন জ্যাক। বাঁসীতে শাসকরূপে এসে বসলেন, ইংরেজ-রেসিডেন্ট। গঙ্গাধর রাও-এর বিধবারূপে রাণী লক্ষ্মীবাঙ্গী তাঁর খরচের জন্যে প্রতিমাসে মাত্র পাঁচহাজার টাকা পেন্সন পাবেন।

অসহায় বিধবা রাণীকে বাধ্য হয়েই সে বিধান মেনে নিতে হলো।

নিজের প্রাসাদ থেকে যথনি চেয়ে দেখেন, বাঁসীর ছর্গের মাথায় উড়ছে যুনিয়ক জ্যাক, তখনি এক অব্যক্ত বেদনায় জলে ওঠে তাঁর অন্তর। সে-আগুনে যেন পুড়ে ছাই হয়ে আসে দেহ-মন। সে আগুনের জ্বালা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে রাণী লক্ষ্মীবাঙ্গী আরো গভীরভাবে ধর্ম-কর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করেন।

উড়ুক যুনিয়ক জ্যাক বাঁসীর ছর্গে, তিনি সেদিকে আর দৃষ্টি দেবেন না।

কিন্তু ইংরেজ-শাসক তাঁকে সেকথা ভুলে থাকতেও দেন না!

যত দিন যায়, রাণী লক্ষ্মীবাঙ্গী ততই বুঝতে পারেন, তাঁর নিজের ঘরে তাঁকে ভিখারিণী হয়েই থাকতে হবে! প্রত্যেক কাজে ইংরেজ-রেসিডেন্ট তাঁকে বুঝিয়ে দেন, ইংরেজের দয়ায় তাঁর জীবন নির্ভর করছে।

পঞ্চকন্যা

দামোদরের যখন সাত বছর বয়স হলো, যথারীতি তার উপনয়ন দেবার জন্যে তিনি আয়োজন করলেন। রাজ্যের প্রকৃত মালিক সে, তার উপনয়নে রাজ্য হবে উৎসব। কিন্তু সে-উৎসবের আয়োজনের মত অর্থ তো রাণীর হাতে নেই! রাণীর রাজ-ভাণ্ডার ইংরেজের দখলে! সে ভাণ্ডারে রাণীর অধিকার নেই। দামোদর যখন সাবালক হবে তখন সে টাকা সে পাবে। তার আগে-পর্যন্ত দামোদরের অভিভাবকরূপে ইংরেজ-রেসিডেন্টই সেই ভাণ্ডার রক্ষা করবেন।

রাণী রেসিডেন্টের কাছে আবেদন করলেন, সেই রাজ-ভাণ্ডার থেকে তাঁকে একলক্ষ টাকা ধারস্বরূপ দেওয়া হোক।

অনেক অবেদন নিবেদনের পর ইংরেজ-রেসিডেন্ট জানালেন, যদি রাণীর হয়ে রাজ্যের চারজন ধনী ও সন্ত্রাস্ত লোক জামীন হতে পারেন, তাহলে রাণীকে সেই টাকা ধার দেওয়া যেতে পারে!

নিজের টাকা থেকে নিজে ধার নেওয়া এবং তার জন্যে, রাণী হয়ে চারজন প্রজার জামীন-ভিক্ষা!

এ অপমান কঁচীর মতন রাণীর অন্তরে বিধতে থাকে।

কিন্তু তখন তিনি নিরূপায়। বাধ্য হয়েই সেই হীন সর্বে টাকা ধার নিয়ে তিনি পুত্রের উপনয়ন-উৎসব শেষ করলেন।

*

*

*

অন্তরের আগুন অন্তরে চাপা রেখে রাণী লক্ষ্মীবাঈ একান্ত নিষ্ঠাসহকারে তাঁর প্রতিদিনের কর্তব্য পালন ক'রে চলেন।

প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শয়া থেকে উঠতেন। পরিচারিকারা আতর দিয়ে স্নানের জল তৈরী ক'রে রাখতো।

পঞ্চকন্যা

সেই স্বাসিত জলে স্নান সেবে তিনি শুভ চান্দেরী-শাড়ী প'রে
পূজার জন্যে মন্দিরে প্রবেশ করতেন। স্বামীর ঘৃত্যার পর শাস্ত্রের
রীতি হলো মাথার চুল কামিয়ে ফেলে দেওয়া, কিন্তু পুরোহিতদের
পরামর্শে তিনি তা করেন নি; সেইজন্যে অতিদিন প্রভাতে পূজায়
বসবার আগে তার প্রায়শিচ্ছ-স্বরূপ তুলসী-বৃক্ষে জলদান করতেন
তারপর আরম্ভ করতেন পার্থিব পূজা...তখন মন্দিরের প্রাঙ্গণ
থেকে দরবারের বাদকেরা মঙ্গল-বাটু বাজাতে সুরু করতো।
রান্নাগেরা এসে পড়তে সুরু করতেন, পুরাণ। একমনে তিনি
সেই পুরাণ-পাঠ শুনতেন। পুরাণ-পাঠ শেষ হ'লে, তিনি মন্দির
ত্যাগ ক'রে দরবারের সংলগ্ন নিজের ঘরে গিয়ে বসতেন। সেখানে
রাজ্যের সমস্ত সন্ধান্ত সর্দার আর কর্মচারীরা সমবেত হয়ে তাঁদের
রাণীকে শ্রদ্ধা জানাতেন। রাণী তাঁদের প্রত্যেকের কুশল সংবাদ
জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁর রাজ্যে সাড়ে সাতশো কর্মচারী ছিলেন।
এই সাড়ে-সাতশো জন লোকের প্রত্যেককে তিনি ব্যক্তিগতভাবে
জানতেন। একদিন কেউ অভুপদ্ধিত হ'লে, তক্ষুনি তাঁর নজরে
তা পড়তো এবং তার সংবাদ নেবার জন্যে তৎক্ষণাং লোক
পাঠাতেন। এইভাবে প্রভাতের কাজ শেষ হয়ে এলে, তিনি
আবার অস্তঃপুরে প্রবেশ করতেন এবং দিনের খাওয়া শেষ ক'রে
একঘণ্টা কাল বিশ্রাম করতেন। বিশ্রামের পর, তাঁর সামলে
সকালবেলাকার যে-সব নজরানা উপহার পেতেন সেগুলো এনে
ধরা হতো। তার মধ্যে থেকে ছ-একটি জিনিস নিজে নিয়ে,
অবশিষ্ট সমস্ত উপহার-সামগ্ৰী তিনি কুঠীওয়ালার * হাতে দিয়ে
দিতেন, প্রাসাদের কর্মচারী আর ভৃত্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার
জ্যে। এইভাবে দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হয়ে যেতো। তখন, ঠিক

* যার উপর রাজপ্রাসাদের ভেতরকার ব্যবস্থার ভাব ছিল।

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠୀ

ବେଳା ତିନଟେର ସମୟ ତିନି ଦରବାରେ ଆସନ୍ତେନ । ଦରବାରେ ଆସନ୍ତେନ, ନାରୀର ପୋଷାକେ ନୟ । ପୁରୁଷେର ପୋଷାକେ ତିନି ଦରବାରେ ନିଜେର ଆଲାଦା ସରେ ଏସେ ବସନ୍ତେନ । ତାଁର ସରେର ସାମନେ ଝାଲରେ ପର୍ଦା ଦେଉୟା ଥାକତୋ । ମେହି ପର୍ଦାର ବାଇରେ ଦରବାରେର କର୍ମଚାରୀରା ଏବଂ ପ୍ରଜାରା ଏସେ ଜଗା ହତୋ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଲଙ୍ଘଣ ରାଓ-ଏର ମାରଫତ ତିନି ଅଜାଦେର ଅଭାବ-ଅଭିଯୋଗ ଶୁନନ୍ତେନ ଏବଂ ତାଁର ମାରଫତେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟେର ଆଦେଶ ଦିତେନ । କୋଣୋ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଦଲିଲପତ୍ର ବା ନଥୀ ଥାକଲେ ଲଙ୍ଘଣ ରାଓ ତାଁକେ ପଡ଼ିଯେ ଶୋନାନ୍ତେନ ଏବଂ ତିନି ନିଜେ ବିଚାର କ'ରେ ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଆଦେଶ କରନ୍ତେନ, ତାର ଜ୍ବାବ ଲିଖନ୍ତେ । କଥନଓ କଥନଓ ତିନି ନିଜେର ହାତେଓ ଜ୍ବାବ ଲିଖେ ଦିତେନ । ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ମାମଲା ତିନି ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତେନ, ଯାତେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଅବିଚାର କାରୁର ପ୍ରତି ନା ହୟ, ତାର ଜଣେ ତାଁର ସତ୍ତ୍ଵର କ୍ରାଟି ଛିଲ ନା । ମେହି ତରଣୀ-ନାରୀର ବିଚାର-ବୁଦ୍ଧି, ଚିନ୍ତାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଶ୍ରାୟନିଷ୍ଠା ଦେଖେ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଁକେ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତେନ । ଏହିଭାବେ ଅପରାହ୍ନ-ଶେଷେ ସାଯ়ଂ-ସନ୍ଧ୍ୟା ନେମେ ଆସନ୍ତୋ । ମହାଲଙ୍ଘୀର ମନ୍ଦିରେ ଆରତିର ବାଜନା ବେଜେ ଉଠନ୍ତୋ । ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଓ ମଙ୍ଗଲବାର ଦରବାରେର କାଜ ସେରେ ପୂଜାରିଗୀର ବେଶେ ତିନି ପାଯେ ହେଟେ ମହାଲଙ୍ଘୀର ମନ୍ଦିରେ ଯେତେନ । ରାଜ୍ୟେର ଦୁଃଖ ପ୍ରଜାରା ସେ ସଂବାଦ ଜାନନ୍ତୋ । ତାଇ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଲ ଆର ଶୁକ୍ରବାର ମହାଲଙ୍ଘୀର ମନ୍ଦିରେ ଯାବାର ପଥେର ଛୁଧାରେ ତାରା ଭିଡ଼ କ'ରେ ଦୀଡାତୋ ସାକ୍ଷାତ୍-ଭାବେ ରାଗୀର କାହେ ତାଦେର ଆବେଦନ ପୌଛେ ଦେବାର ଜଣେ । ରାଗୀ ମାଦରେ ତଥନ ତାଦେର କଥା ଶୁନନ୍ତେନ, ଯଥାସାଧ୍ୟ ତାଦେର ଅଭାବେର ପ୍ରତିକାରେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେନ ।

ଏହିଭାବେ ଏକଟି ବିଧବୀ ତରଣୀ-ନାରୀ ଏକା ରାଜ-ରାଗୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାୟ ନିଜେର ଜୀବନକେ ନିଜେ ପରିଚାଲିତ କ'ରେ ନିଯେ ଚଲେଛିଲେନ ।

পঞ্চকন্যা

*

*

*

সেদিন মহালক্ষ্মীর মন্দিরে পূজা সেরে যখন পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, দেখেন, সামনে পথ রোধ ক'রে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তাদের রোধ করবার জন্যে প্রতিহারীরা বৃথা চেষ্টা করছে। প্রতিহারীদের ঠেলে ফেলে দিয়ে সেই জনতা রাণীর দিকে চৌঁকার করতে করতে এগিয়ে এলো।

রাণীর সঙ্গেই মন্ত্রী লক্ষণরাও ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার ?

মন্ত্রী জানালেন, রাজ্যের দরিদ্র লোকেরা এবং ভিখারীরা এসেছে আপনার কাছে তাদের একটা আবেদন নিয়ে।

রাণী জিজ্ঞাসা করেন, কি আবেদন ?

—এবার শীত নিরাকৃত পড়েছে। এই শীতে গায়ের কোনো আবরণ না থাকার দরুণ দরিদ্র লোকেরা বড়ই কষ্ট পাচ্ছে।

সেইকথা শুনে রাণী তৎক্ষণাত আদেশ করলেন, ওদের জানিয়ে দিন, আজ থেকে তিনদিন পরে, ওরা যেন সকলে প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হয়।

প্রাসাদে ফিরে গিয়ে রাণী মন্ত্রীকে আদেশ করলেন, তিনদিন পরে প্রাসাদের সামনে যত লোক আসবে, প্রত্যেকে যেন একটা ক'রে কম্বল আর মাথায় দেবার জন্যে একটা ক'রে টুপী পায়।

নির্দিষ্ট দিন প্রাসাদের সামনে শত শত দরিদ্র লোক তৃপ্ত-অন্তরে জয়েল্লাস ক'রে উঠলো, জয় রাণী লক্ষ্মীবাস !

প্রজাদের ওপর রাণীর এই প্রভাব, ইংরেজ-রেসিডেন্ট বিশেষ উপভোগ করতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত কাজের

পঞ্চকন্যা

মধ্যে এতটুকুও ছিদ্র খুঁজে বার করতে পারছিলেন না, যার মধ্যে
দিয়ে রাণীকে তিনি জব্দ করতে পারেন।

এইভাবে বাঁসীতে নিঃশব্দ-ধারায় পাশাপাশি ছট্টো শাসন-তত্ত্ব
পরম্পর ঠোকাঠুকি ক'রে বয়ে চলেছিল।

এমন সময় বাইরে থেকে এলো ঝড়...উত্তর-ভারত থেকে মধ্য-
ভারতের বঙ্গুর পথ ডিঙিয়ে এলো প্রলয়ের ঝড়...

*

*

*

বিঠুরে পেশওয়ার-প্রাসাদে নিভৃতকক্ষে গোটাকতক লোক
গভীর ভাবে কি পরামর্শ করছেন!

পেশওয়া আজ নামে মাত্র পেশওয়া। কোথায় শিবাজী...
কোথায় সে সর্বজয়ী ভাগওয়া বাণী...কোথায় মহারাষ্ট্রের সেই
পার্বত্য-সৈনিকের দল...যারা একদিন স্ফপ্ত দেখেছিল ভারত-জোড়া
এক অখণ্ড হিন্দুস্থানের।

শেষ-পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এই বিঠুরের প্রাসাদেই দেহ ত্যাগ
করেছেন...তার জন্মে একবিন্দু চোখের জল কেউ ফেলেনি, কেউ
ফেলতেও চায়নি। নিজের রাজ্য ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে,
ইংরেজের কুপা-দন্ত পেন্সন্ নিয়ে তিনি মহারাষ্ট্র ত্যাগ ক'রে
বিঠুরে চলে আসেন এবং সেখানেই রাজ্যহীন রাজা সেজে বিপুল
ঐশ্বর্যের মধ্যে পরম-সুখে ভারতবর্ষের নিধন-যজ্ঞে স্বহস্তে ইন্ধন
জুগিয়ে চলেছিলেন। ইংরেজরা দয়া ক'রে তাঁর এই সাহায্যের
জন্মে তাঁকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা ক'রে পেন্সন্ দিতেন।
এই আট লক্ষ টাকার বদলে বাজীরাও, মহারাষ্ট্র-জাতটাকে
বিকিয়ে দেন।

ইতিহাসে বলে, শিখ-নেতা গুরু গোবিন্দসিং, ওরঙ্গজেবের

পঞ্চকন্ত্রা

বিরুদ্ধে ভারতের সামরিক-শক্তিকে এক করবার জন্যে একদিন নাকি
সন্ধ্যাসৌর ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্রে এসেছিল—মহারাষ্ট্র আর শিখ একত্র
যাতে হ'তে পারে, পরম্পর পরম্পরকে যাতে সাহায্য করতে
পারে সেদিন তা হয়নি।

তারপর মূল চলে গেল, মহারাষ্ট্র চলে গেল, এলো—ইংরেজ।
একে একে সকলে পদানত হলো ইংরেজের। হলো না, শিখ। শিখেরা
শেষবারের মত চেষ্টা করলো বাঁচাতে ভারতবর্ষকে। কিন্তু কোনো
ভারতবাসী তাদের করলো না সাহায্য। উল্টে, তাদের বিরুদ্ধে
ইংরেজদের করলো সাহায্য। ইংরেজরা যখন শিখদের পরাধীন
করবার জন্যে পাঞ্জাবে হানা দিলো, তখন মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধি
এই বাজীরাও অর্থ আর সৈন্য দিয়ে তাদেরই করলেন সাহায্য। গুরু
গোবিন্দসিং মহারাষ্ট্রে এসেছিলেন মারাঠাদের বন্ধুত্ব ভিক্ষা ক'রে—
বাজীরাও পাঞ্জাবে মারাঠাদের পাঠালেন গুরু গোবিন্দসিং-এর
বংশধরদের পায়ে শৃঙ্খল পরাতে। এই হলো ভারতবর্ষের ইতিহাসের
ট্রাজেডী। এই বিচ্ছিন্নতা...এই হলো ভারতের চরম অভিশাপ।
তাই অথগু ভারত—এক কেন্দ্রীভূত ভারত হলো ভারতবাসীর পরম
রাজনৈতিক লক্ষ্য। সে-ভারতবর্ষ হবে পৃথিবীতে অজ্ঞয়।

সেদিনও ভারতবাসী তা বোঝেনি। বোঝেনি বলেই, এই ছশে
বছরের পরাধীনতা।

বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন, তাঁর দ্বন্দক
পুত্র—নানাসাহেব। লর্ড ডালহাউসী তাঁর তৈরী আইনের তলোয়ার
তুললেন নানাসাহেবের ওপর, বাজীরাও-এর দ্বন্দকপুত্রকে তাঁরা আট
লক্ষ টাকার পেন্সন দেবেন না।

নানাসাহেব তাতে বিশেষ বিচলিত হলেন না। ছেলেবেলা থেকে

তাঁর অন্তরে অতি-সংগোপনে তিনি তার চেয়ে বৃহৎ এক দাবিকে লালন-পালন ক'রে আসছিলেন...ভারতের স্বাধীনতা। কিশোরকাল থেকে তিনি মনে মনে স্বপ্ন দেখতেন, কি ক'রে ভারতবর্ষকে এক-সূত্রে বাঁধা যায়, বিদেশীদের তাড়িয়ে হিন্দুস্থানে গ'ড়ে তোলা যায় এক অথঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্র। তাঁর সেই গোপন-সঙ্কল্পের কথা জানতেন আর-একজন লোক—তান্ত্রিয়া টোপী। ভাগ্যক্রমে তান্ত্রিয়া টোপীও বালক অবস্থাতেই বিঠুরের রাজপ্রাসাদে আসেন এবং সেখানকার একজন সাধারণ হিসাবনবিসের কাজ করতেন। এই নিরীহ মারাঠীর অন্তরেও নানাসাহেবের মতন, ভারতবর্ষের পরাধীনতার জ্বালা অষ্ট-প্রহর জ্বলতো। নানাসাহেবে স্থির করলেন, শেষবারের মতন তিনি চেষ্টা ক'রে দেখবেন, বিদেশী ইংরেজকে এ-দেশ ছাড়া করতে পারেন কি না। তার জন্মে নিঃশব্দে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সারা ভারত-বর্ষের মধ্যে তিনি একটা চক্রান্ত গ'ড়ে তুলতে লাগলেন। এত কৌশলে তিনি এই বিরাট চক্রান্ত গ'ড়ে তোলেন যে, ইংরেজরা প্রথম প্রথম তার কিছুই জানতে পারেনি।

সতেরো-শো সাতান্ন সালে পলাশীর প্রান্তরে বিদেশীদের হাতে আমাদের দেশকে আমরা তুলে দিই। প্রায় একশো বছর তার পূর্ণ হয়ে আসছে। আজ ইংরেজ সারা ভারতবর্ষে তার শাসন জঁকিয়ে বসেছে। নানাসাহেব স্থির করলেন, তাঁরা পলাশীর প্রাজ্যের শতবার্ষিক-স্মৃতি পালন করবেন। একশো বছর আগে যে অপরাধ আমরা করেছিলাম, একশো বছর পরে তার প্রায়চিন্ত করতে হবে। স্থির করলেন, আঠারো-শো সাতান্ন সালে বিশ্ব ঘোষণা করতে হবে এবং সেই লক্ষ্য ঠিক রেখে তাঁরা ভারতব্যপী এক বিশ্ববের পরিকল্পনা গ'ড়ে তুলতে লাগলেন।

তখন দিল্লীর সিংহাসনে মুঘলশক্তির শেষ অতিনিধিষ্ঠিত বাহাদুর

পঞ্চকন্ত্যা

শাহ নামমাত্র রাজত্ব করছিলেন। নানাসাহেব বাহাদুর শাহ-এর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাঁকেই আগামী বিপ্লবের প্রধান অধিনায়ক স্থির করিলেন। দিল্লীর সিংহাসনকে ধিরে ভারতের হিন্দু আর মুসলমান আবার একসঙ্গে দাঁড়াবে, ত'জনের এক যে শক্ত, তার বিরুদ্ধে। বাহাদুর শাহ পূর্ণমাত্রায় এই আন্দোলনে যোগদান করলেন। তখন নানাসাহেব সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ছদ্মবেশে তাঁর চরদের পাঠালেন। যেখানে যেখানে দেশী-সিপাইদের ছাউনি আছে, সেখানে সেখানে ছদ্মবেশে নানাসাহেবের চরেরা আগামী-বিপ্লবের কথা প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগলো এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটি গ'ড়ে উঠতে লাগলো। যে অপূর্ব কৌশলে এই বিরাট চক্রান্ত নানাসাহেব গ'ড়ে তুলেছিলেন, তার সম্পূর্ণ ইতিহাস যেদিন প্রকাশিত হবে, সেদিন দেখা যাবে, এই একটি লোক সেদিন কি অসাধ্যসাধনই না করেছিলেন। গণৎকার, সন্ন্যাসী, ফিরওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা সেজে বিপ্লবীদের চরেরা ইংরেজ-প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে, বিভিন্ন দুর্গের ভেতরে গিয়ে সিপাইদের মধ্যে প্রচারকার্য করতো। তাদের প্রতীক ছিল, পদ্মফুল আর হাতে-তৈরী-করা ঝুঁটি। এক ছাউনি থেকে আর এক ছাউনিতে এই রহস্যময় পদ্মফুল যাতায়াত করতো। এই পদ্মফুল গ্রহণ করার মানেই ছিল, বিপ্লবীদের দলে যোগদান করার সম্মতি। তখন দলের মধ্যে যারা এই বড়বস্ত্রে যোগদান করতে রাজী হতো, তারা একজন নায়ক নিজেদের মধ্যে ঠিক ক'রে নিতো এবং সেদিন তারা হাতে-তৈরী-করা একখানা ঝুঁটি থেকে একটু একটু ভেঙ্গে সকলে একসঙ্গে মুখে দিতো, সেই ছিল তাদের শপথ, তারা একসঙ্গে সবাই মিলে ঘৃত্যপথ ক'রে এই আন্দোলনে যোগদান করলো। এইভাবে সেদিন নানাসাহেব নিঃশব্দে সারা ভারতের

মধ্যে পলাশীর শতবার্ষিকী-স্মৃতি পালনের এক অপূর্ব উদ্ঘোগ
প্রায় সম্পূর্ণ করে আনছিলেন।

যতই আঠারো-শো সাতাহ সাল এগিয়ে আসতে লাগলো,
ততই পথে-ঘাটে বাজারে কি যেন একটা রহস্যময় কথা বাতাসে-
বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ক্রমশঃ ইংরেজরা
সন্দিক্ষ হয়ে উঠলো। সন্ধ্যাসী দেখলেই, গণকার দেখলেই তারা
সন্দেহ ক'রে তাকে বন্দী করে, নানারকমে নির্যাতন ক'রে তার
কাছ থেকে কথা বার করতে চেষ্টা করে। একবার এক সিপাইদের
ছাউনিতে এক ইংরেজ-ক্যাপ্টেনের হাতে বিপ্লবীদের সেই প্রতীক-
রুটি এসে পড়ে। ক্যাপ্টেনের ধারণা, সেই রুটির মধ্যে নিশ্চয়ই
কোনো গোপন চিঠি লুকানো আছে। রুটিটাকে টুকরো টুকরো
ক'রে ভেঙে ছিঁড়ে সাহেব তার মধ্যে কোনো গোপন চিঠির সন্ধান
না পেয়ে আরো সন্দিক্ষ হয়ে উঠলো, নিশ্চয়ই তাহ'লে এই রুটির
মধ্যে নির্দারণ কোনো বিষ মেশানো আছে। কোনো-কোনো
শহরে ইংরেজরা ভয়ে তাদের বাবুচি-আয়াদের কাজ ছাড়িয়ে দিলো,
দেশী লোকদের হাত থেকে কোনো কিছু নিতে তারা শক্তি হয়ে
উঠলো। চারদিকে একটা থমথমে ভাব।

প্রত্যেক বিপ্লবী-কেন্দ্রে শেষ-সংবাদ জানানো হলো, যেন তারা
নিজে থেকে কোনো বিপ্লব-ঘোষণা না করে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে
ভারতবর্ষের চারদিক থেকে সকলে একসঙ্গে বিপ্লব-ঘোষণা করা হবে।
প্রত্যেক কেন্দ্রেই তাই আদেশ দেওয়া হয়, দিল্লী থেকে সেই
উত্থানের আদেশের জন্যে যেন তারা অপেক্ষা ক'রে থাকে। যথাসময়ে
প্রত্যেক কেন্দ্রে অভুয়খানের তারিখ সময় থাকতেই জানানো হবে।

কিন্তু ব্যারাকপুরের ছাউনিতে যে গোপন কেন্দ্র ছিল, সেই
কেন্দ্রের একজন প্রধান বিপ্লবী ছিলেন সিপাই মঙ্গল পাণ্ডে।

পঞ্চকন্তৃ

মঙ্গল পাণ্ডে নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারলেন না। তাঁর মনে যেন দাবানল জলছিল। সে দাবানলকে তিনি আর কিছুতেই নিজের মধ্যে সংযত ক'রে রাখতে পারলেন না। তাই দলের নির্দেশকে অমান্য ক'রে তিনি একদিন বিপ্লব-ঘোষণার আগেই তলোয়ার হাতে উন্মাদের মত ছাউনির মাঠে লাফিয়ে প'ড়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, মার, ফিরিঙ্গী মার !

মঙ্গল পাণ্ডের সেই অকাল-উভ্রেজনার ফলে দেখতে দেখতে ব্যারাকপুর ছাউনিতে বিপ্লবের বক্তি জলে উঠলো এবং দাবানলের মত সেইকথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। দিল্লী থেকে নির্দেশ আসার আগেই এলোমেলোভাবে চারদিকে বিপ্লব মাথা তুলে উঠলো। মার, মার, ফিরিঙ্গী মার, এই শব্দে সারা উত্তর-ভারত অনুরণিত হয়ে উঠলো।

*

*

*

ইংরেজ-রেসিডেন্টের ব্যবহারে রাণী লক্ষ্মীবাঈ বুবাতে পেরেছিলেন, তাঁকে যদি বাঁসীতে থাকতে হয়, তাহ'লে ইংরেজের অনুগ্রহের দানে একান্ত দীনভাবে জীবন যাপন করতে হবে। যখনি স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করতে যান, তখনই ইংরেজ-শাসকের কাছ থেকে বাধা পান। ছেলেবেলা থেকে তিনি একান্তভাবে স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন, তাঁর মনের ওপর বাইরের কারুর আধিপত্য তিনি সহ করতে পারতেন না।

তাই ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাইরের সমস্ত কাজকর্ম থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে আনছিলেন এবং ঠিক করেছিলেন, বাঁসী ত্যাগ ক'রে তিনি পুণ্যধার বারাগসীতে গিয়ে বাস করবেন। অবশিষ্ট জীবন কাশীগ্রামের আরাধনায় নিঃশব্দে অতিবাহিত ক'রে দেবেন।

কিন্তু ভবিতব্যতা তাঁকে সহমা অন্ত-এক পথে টেনে নিলো...
বৈরাগ্যের সম্পূর্ণ উণ্টে পথ...সংগ্রামময় কর্মের পথ।

পঞ্চকল্যা

বিপ্লবের চেউ দেখতে দেখতে ঝাঁসীতে এসে পৌছলো। - দেশী
সিপাইরা পথে-ঘাটে যেখানে ইংরেজ দেখতে পেলো, সেইখানেই
হত্যা করতে সুরু ক'রে দিলো। ঝাঁসীর তুর্গের ভেতর তখন ইংরেজ
সেনানায়ক গর্ডন আর স্কীন বন্দী হয়ে পড়লেন।

তুর্গের বাইরে থেকে ত্রুদ্ধ সিপাইরা তুর্গ দখল করবার জন্যে
আক্রমণ করলো।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর নারী-হৃদয় সেই নিরীহ ইংরেজ-নাগরিকদের
হত্যায় ব্যথিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে উন্মাদ-তরঙ্গকে বাধা দেবার
ক্ষমতা তিনি কোথায় পাবেন ?

ক্যাপ্টেন স্কীন নিরুপায় দেখে, গোপনে কয়েকজন ইংরেজকে
ছদ্মবেশে রাণীর কাছে পাঠালেন সাহায্যের আবেদন জানিয়ে। কিন্তু
তারা রাণীর কাছ পর্যন্ত পৌছলো না। পথেই বিপ্লবীরা তাদের
হত্যা ক'রে ফেললো।

এধারে তুর্গের মধ্যে খান্দ যা ছিল, তা ফুরিয়ে এলো। অগত্যা
স্কীন, তুর্গের ওপরে শ্বেত-পতাকা উড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা
করলেন। বিজয়ী-সিপাইরা জয়োল্লাসে তুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলো,
এবং সম্পূর্ণভাবে তুর্গ দখল ক'রে নিলো। তুর্গের মধ্যে যে-কয়েক
জন ইংরেজ-সেনানায়ক ছিলেন, তাদের বন্দী করার বদলে, হত্যা
করেই বিপ্লবীরা তাদের কাজ হাঙ্কা ক'রে ফেললো।

সমগ্র ঝাঁসীর মধ্যে একটিও ইংরেজ আর জীবিত রইলো না।
উন্মাদ জনতা রাজপ্রাসাদের সামনে এসে জয়োল্লাসে ঘোষণা করলো,
'মুলুক খোদাকা, মুলুক বাদশা কো, আম্বাল রাণী লক্ষ্মীবাঈ কা...'

পৃথিবী হলো, ভগবানের...

ভারত-সাম্রাজ্য হলো, বাদশাহ...।

আর এই রাজ্যের অধিনায়ক হলেন, রাণী লক্ষ্মীবাঈ !

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠ

ଯେ-ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କ'ରେ ତିନି ସନ୍ଧ୍ୟାସ ନିତେ ଚାଇଛିଲେନ, କଯେକ-
ଦିଲେର ମଧ୍ୟେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଵାଧୀନ ଶାଶକରୂପେ ତାକେ ସିଂହାସନେ
ବସତେ ହଲୋ ରାଜଦଣ୍ଡ ନିଯେ ।

ସ୍ଵାଧୀନରାଷ୍ଟ୍ରରୂପେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ଅବିଲମ୍ବେ ଝାଁସୀକେ ଗ'ଡେ ତୁଳତେ
ଲାଗଲେନ । ଝାଁସୀର ଦୁର୍ଗ-ଚୂଡ଼ାୟ ଉଡ଼ିଲୋ ଆବାର ମାରାଠାର ‘ଭାଗଓୟା
ଝାଣ୍ଡ’ ।

*

*

*

କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଥେକେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ-ଏର ଜୀବନେ ଯେ ତୀର୍ତ୍ତ
ଆଲୋଡ଼ନ ଜେଗେ ଉଠିଲୋ, ତା ଶେଷ ହଲୋ ତାର ଚିତାଶୟାୟ ।

ଏକଜନ ଅସହାୟ ତରଙ୍ଗୀ ବିଧବୀ-ନାରୀ ଏକଟା ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ହେୟ
ବସଲୋ ଦେଖେ, ଆଶେପାଶେର କ୍ରମତା-ଲୋଭୀ ରାଜାଦେର ଟନକ ନ'ଡେ
ଉଠିଲୋ । ଭାରତବର୍ଷେ ଇତିହାସେର ହର୍ଭାଗ୍ୟ ! ଭାରତେର ସମସ୍ତ ଅଧୋଗତିର
ମୂଳ ଉତ୍ସ, ଭାରତେର ଏହି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଛେଟଗୁଲି । ଭାରତବର୍ଷେର
ସୃହତ୍ତର ଅନ୍ତିମେର ଦିକେ ଭୁଲେଓ ତାରା ଏକବାର ଚେଯେ ଦେଖେ ନା ।
ସର୍ବଦାଇ ଚେଷ୍ଟା, କି କ'ରେ ପ୍ରତିବେଶୀର ଦୁର୍ବଲତାର ସୁଯୋଗେ ତାକେ ଗ୍ରାସ
କରା ଯାଯ । କି କ'ରେ ପ୍ରତିବେଶୀର ଚେଯେ ନିଜେକେ ବଡ଼ ବ'ଲେ ଜାହିର
କରା ଯାଯ ।

ସାରା ଦେଶ ଯଥନ ବିପ୍ଲବେର ଆଣ୍ଟନେ ଜଲଛେ, ଚାରଦିକେ ଅଶାନ୍ତି
ବାଇରେ ଶକ୍ରକେ ନିର୍ମୂଳ କରବାର ଜଣ୍ଣେ ଯଥନ ଶେଷବାରେର ମତନ ଭାରତ
ନିଜେକେ ସଂଯତ କରବାର ଚେଷ୍ଟା କରଛେ, ତଥନ ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟାଗେର ମଧ୍ୟେ
ଏମନ ଲୋକେରାଓ ଅଭାବ ଘଟିଲୋ ନା, ଯାରା ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗେ
ନିଜେଦେର ସ୍ଵାର୍ଥକେଇ କାଯେମୀ କରବାର ଜଣ୍ଣେ ଛିଦ୍ରପଥ ଖୁଁଜିଲେ ଲାଗଲୋ ।
ଭାରତବର୍ଷେ ସେଇ ସୃହତ୍ତର-ସଂଗ୍ରାମେ ସାହାୟ କରା ଦୂରେ ଥାକୁ, ତାରା
ଚେଷ୍ଟା କରତେ ଲାଗଲୋ, ସେଇ ସୁଯୋଗେ କି କ'ରେ କିଛୁ ଲୁଠତରାଜ
କ'ରେ ନିତେ ପାରେ ।

ଆଜା ତାରା ଆଛେ, ସେଦିନା ତାରା ଛିଲ । ତାରା ହଲୋ ବିଦେଶୀ-
ଦେର ଚେଯେ ଚେର ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ ଶକ୍ର...ଆମାଦେର ଆପନ-ଜନ ।

ଏମନି ଏକଜନ ଶୁଭିଧାବାଦୀ ଲୋକ ଛିଲେନ ସଦାଶିବ ରାଓ । ଝାଁସୀର
ପରଲୋକଗତ ରାଜା ଗନ୍ଧାଧରେର ତିନି ଆଜୀଯ ଛିଲେନ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ମରେ
ତିନି ମନେ କରତେନ, ଝାଁସୀର ଗଦିତେ ତାରଇ ଅଧିକାର । ବିଶ୍ୱବୀରା
ଯଥନ ଟଙ୍କରେଜଦେର ଝାଁସୀ ଥେକେ ତାଡ଼ିଯେ ଦିଲୋ । ତଥନ ତିନି ଶୁଷୋଗ
ବୁଝେ ତାର ବୀରତ୍ବ ଜାହିର କରତେ ଉଦ୍‌ଗ୍ରୀବ ହୟେ ଉଠିଲେନ । ଏବଂ ବହୁ
ଚେଷ୍ଟାଯ ଏକଟା ସେନାଦଳ ତୈରୀ କ'ରେ ତିନି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାନ୍ଦିକେ ଜାନାଲେନ,
ଅବିଲମ୍ବେ ଯେନ ତିନି ଝାଁସୀର ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କ'ରେ ଚଲେ ଯାନ । କାରଣ,
ଝାଁସୀର ଆୟମନ୍ତ ମାଲିକ ତିନିଇ । ସଦି ତାର ଆଦେଶମତ କାଜ ନା
କରା ହୟ, ତାହ'ଲେ ଅବିଲମ୍ବେ ତିନି ଝାଁସୀ ଆକ୍ରମଣ କ'ରେ ଦଖଲ
କ'ରେ ନେବେନ ।

ସଦାଶିବ ରାଓ ଭେବେଛିଲେନ, ଏକଜନ ତରୁଣୀ ବିଧବା-ନାରୀ ତାର
ମେଇ ହମକିତେ ଭୟ ପେଯେ ସିଂହାସନ ଛେଡେ ଦେବେ । ତିନି ଜାନତେନ
ନା, ତଥନ କେଉଁ ଜାନତୋ ନା, ମେଇ ତରୁଣୀ-ନାରୀ କି କଠିନ ଧାତୁତେ
ଗଡ଼ା ଛିଲ । ଭାରତବର୍ଷେ ଇତିହାସେ ତାର ମତନ ବୀର-ନାରୀ ଥୁବ କମାଇ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେଛେ ।

ସଦାଶିବ ରାଓ-ଏର ମେଇ ଚିଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀବାନ୍ଦି ଅବଜ୍ଞାଭରେ ଛିଁଡ଼େ ଫେଲେ
ଦିଲେନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଆଦେଶ କରଲେନ, ଅବିଲମ୍ବେ ଯୁଦ୍ଧାତ୍ମାର ଆୟୋଜନ
କରତେ । ଝାଁସୀର ସିଂହାସନେ ବସାର ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାନ୍ଦି ବିଚକ୍ଷଣ
ଶାସକେର ମତନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଭାଗ ନିଜେ ଦେଖତେନ ।
ସୈଅଦେର ନତୁନ କ'ରେ ନିତ୍ୟ କୁଚକାଓୟାଜେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ସଜାଗ କ'ରେ
ତୁଳତେନ...ଝାଁସୀର ଦୁର୍ଗେ ଯେଥାନେ ଯା ଛିନ୍ଦିପଥ ଛିଲ, ତା ସଂକ୍ଷାର କରଲେନ ।
ଝାଁସୀର ପ୍ରବେଶ-ମୁଖେର ଦିକେ ମୁଖ ରେଖେ ଦୁର୍ଗେର ପ୍ରାଚୀରେର ଉପର
'ଘନ-ଗର୍ଜ' ନାମେ କାମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରଲେନ । ପୁରନୋ ଯେସବ କାମାନ

পঞ্চকন্যা

করেন। আমি সেই চঙ্গীর উপাসিকা। আপনারা না পারেন,
আমি নারীবাহিনী তৈরী ক'রে তাদের নিয়ে সংগ্রামে যাবো।

রাণীর সেই তেজোদীপ্ত ভঙ্গী দেখে, আর তাঁর মুখে সেই বীর-
বাণী শুনে দরবারের সর্দাররা অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। বলেন,
আপনি যাদের রাণী, তারা কাপুরুষ নয়!

দেখতে দেখতে রাণীর আদেশে ঝঁসী-ছর্গে রণ-দামামা বেজে
ওঠে। রাণী নিজে পুরুষ-সৈনিকের বেশে রাজ্যের পুরনারীদের নিয়ে
এক নারী-বাহিনী গঁড়ে তুললেন। ফুলের মালার বদলে মারাঠা-
নারীর হাতে খিলিক দিয়ে উঠলো, শান্তি তরবারী। তাঁরই প্রেরণায়
ঝঁসীর পুরুষরাও দলে দলে রাণীর পতাকার তলে এসে দাঁড়ালো।

নারীবাহিনী নথে থাঁর প্রস্তাবের উত্তরে তাঁকে লিখে জানালেন,
এই ছসময়ে কোথায় তাঁর মত লোক তাঁকে সাহায্য করবেন, না,
তার বদলে তিনি এসেছেন তাঁর রাজ্য—ভয় দেখিয়ে আত্মসাঙ্গ
করতে। বীর কখনই এরকম প্রস্তাব করে না!

নথে থাঁ সেই পত্রের উত্তরে আবার লিখে জানালো, ইংরেজদের
কাছ থেকে তিনি যে টাকা পেতেন, সেই টাকাই তিনি পাবেন, যদি
তিনি ঝঁসীর সিংহাসন ত্যাগ করেন।

এই ছবিনীত প্রস্তাবের উত্তরে রাণী জানালেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ-
ভাবে এ-প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন।

নথে থাঁর বিশ্বাস ছিল যে, অতি অল্প আয়াসেই তিনি ঝঁসী-ছর্গ
দখল ক'রে নেবেন। তিনি জানতেন না, ঝঁসীর সেই তরণী-নারী
যুদ্ধ-বিদ্যায় তাঁর শিক্ষক হতে পারতেন।

তাই সামান্য সৈন্য নিয়েই নথে থাঁ ঝঁসীর দিকে অগ্রসর
হলেন। পথে কোনো বাধা না পেয়ে তিনি মনে মনে উল্লিখিতই
হলেন, এবং তাঁর যে ধারণা ছিল, রাণীর এই আশ্ফালন শুধু

পঞ্চকন্যা

মুখের কথা মাত্র—এখন সত্য বলেই মনে হলো। তাই তিনি নিশ্চিন্ত-মনে ছর্গের সৌমানার মধ্যে এসে পড়লেন। দেখতে দেখতে ছর্গের প্রাকার থেকে গোলাম গৌসের নেতৃত্বে একসঙ্গে ঘনগর্জ, ভবানীশঙ্কর, মহাকালী সব গর্জন ক'রে উঠলো। সে অগ্নি-আক্রমণে নথে খাঁর সৈন্ধদল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল; তখন রাণীর নির্দেশমত পাশ থেকে ঝাঁসীর সৈন্ধরা আক্রমণ করলো। সে-আক্রমণে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে নথে খাঁ কোনোরকমে নিজে প্রাণ নিয়ে বাঁচলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাংলি নিজে আহত-সৈন্ধদের সেবার ব্যবস্থা করেন এবং তাদের পরিচর্যার জন্যেই তিনি নারী-বাহিনী গ'ড়ে তুলেছিলেন। আহতদের শিবিরে তিনি নিজে গিয়ে আহতদের সেবা করতেন। রাণীর সেই সেবাময়ী মৃত্তি দেখে...সাধারণ সৈনিকের জন্যে তাঁর ময়তা দেখে, প্রত্যেক সৈন্ধই এক নতুন দৃষ্টিতে তাদের রাণীকে দেখতে শিখলো।

যুদ্ধজয়ের ফলে রাণী লক্ষ্মীবাংলি-এর নাম রাজ্যের প্রত্যেক প্রজার কাছে আরো প্রিয় হয়ে উঠলো। তারা পরম শ্রদ্ধায় সেই তরুণী বিধিবা-নারীকে দেখতে লাগলো।

*

*

*

সিপাহী-বিপ্লবের প্রথম ধাক্কায় ইংরেজরা প্রত্যেক সহর থেকে পরাজিত, নির্ধারিত হয়ে পালাতে আরম্ভ করে। সমগ্র উত্তর-ভারত বিজয়ী বিপ্লবীদের জয়োল্লাসে ভ'রে ওঠে।

কিন্তু নিজেদের মধ্যে সংহতি না থাকার দরুন, অচিরকালের মধ্যে বিজয়ী-বিপ্লবীদের সেই জয়োল্লাস থেমে গেল। ইংরেজ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই বিপদের মধ্যে ফুটে উঠলো। বিপদ যত নিবিড় হয়, ইংরেজদের কর্মশক্তি তত বাড়ে। যেখানে প্রাজ্য

প'ড়ে ছিল, ওস্তাদ-কারিকরদের দিয়ে সেগুলোকে মেরামত করলেন ; আদর ক'রে তাদের নতুন নামকরণ করলেন—মহাকালী, ভবানীশঙ্কর, শক্রসংহার, নলদর-বিজলী, ঘন-গর্জ...।

সে-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গোলন্দাজ ছিলেন গোলাম গোস। বিচক্ষণ সেনাপতির মতন রাণী লক্ষ্মীবাঈ গোলাম গোসকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর রাজনীতির মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের কোনো ভেদ ছিল না। গোলাম গোসও তাঁর রাণীর জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারতেন, দিয়েওছিলেন। রাণীর প্রধান গোলন্দাজ ছিলেন গোলাম গোস, আর প্রধান সেনানায়ক ছিলেন কুয়ার খোদা বক্র...। সেদিন এক পতাকার তলে পাঞ্চাপাণি দাঁড়াতে তাঁদের কোথাও বাধেনি। সিপাহী-বিপ্লবের মূল অধিনায়ক মারাঠী নানাসাহেব—মুসলমান বাহাদুর শাহ-এর আশুগত্য স্বীকার করেই সেই ভারতব্যাপী বিপ্লবে নেমেছিলেন। এক-জাতীয়তার এই দৃষ্টিভঙ্গী সিপাহী-বিপ্লবের একটা প্রধান দান। বিপ্লবের সময় দিল্লী থেকে বাহাদুর শাহ-এর ঘোষণা ভারতের নব-জাতীয়তা-আন্দোলনের অথর্ব দলিল।

সদাশিব রাও যখন নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করেছিলেন যে, রাণীর দৃত দাঁতে তৃণ নিয়ে তাঁর কাছে এলো ব'লে, এমন সময় হঠাৎ তার বদলে এলো ঝাঁসীর সেন্ট্রবাহিনী। সদাশিব রাও বিপর্যস্ত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালালেন, এবং খুঁজতে লাগলেন, কি ক'রে বিদেশীদের সাহায্যে রাণী লক্ষ্মীবাঈকে জন্ম করতে পারেন।

*

*

*

সদাশিব রাও-এর সেই আফালন রাণী লক্ষ্মীবাঈকে শুধু সজাগ

পঞ্চকন্যা

ক'রে দিয়ে গেল। রাণী পুরাদন্ত্ররভাবে মনোযোগ দিলেন নিজের রাজ্যকে আরো দৃঢ় ক'রে গ'ড়ে তোলবার দিকে।

এমন সময় এলো আর-এক বিপত্তি।

তেহরীর নবাবের দেওয়ান, নথে খাঁর দৃষ্টি পড়লো বাঁসীর ওপর। সদাশিব রাও-এর মতন তিনিও ভেবেছিলেন, একজন তরণী বিধবা-নারীকে ভয় দেখিয়ে তিনি কার্য্যোদ্ধার করবেন।

নথে খাঁ দৃত পাঠিয়ে রাণীকে জানালেন, অবিলম্বে তিনি বাঁসী-রাজ্য ছেড়ে দিন, নতুবা তাঁর কুড়ি হাজার সৈন্য প্রস্তুত।

লক্ষ্মীবাংলি মন্ত্রী লক্ষ্মণ রাও-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কি করা যায় মন্ত্রী ?

লক্ষ্মণ রাও স্বত্বাবতই নিরীহ-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি রাণীকে পরামর্শ দিলেন, আমাদের সৈন্য-সংখ্যা নথে খাঁর তুলনায় কিছু নয়, সে-অবস্থায় তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা মানে, পরাজয়। পরাজিত হওয়ার চেয়ে, তার কাছ থেকে কোনো স্বিধাজনক সর্তে আপস করে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

লক্ষ্মীবাংলি, দরবারের অন্ত সব প্রধানদের মতামত নিলেন। সবাই ভীত, পরাজয়ের সন্তানবন্য আতঙ্কিত।

তাঁদের সেই নিবীর্য্যতা দেখে সিংহিনীর মত লক্ষ্মীবাংলি গর্জে উঠলেন, আপনারা পুরুষ...ভেবেছিলাম আপনাদের কাছে সৎ-পরামর্শই পাবো। কিন্তু আপনারা কাপুরুষ !

দরবারের প্রধানেরা লজ্জিত-নতমস্তকে রাণীর সে কথার কোনো জবাব দিতে পারেন না।

লক্ষ্মীবাংলি বলেন, সংখ্যায় বেশী বলে, সিংহ কোনোদিন ফেরু-পালের ভয়ে গুহায় ঢোকে না ? আপনারা ভুলে গেলেন, আমাদের দেবী চণ্ডী, দশপ্রভুরণধারিনী...একা দশ হল্টে তিনি অসুর ধূঃস

অনিবার্য দেখে লোকে হতাশ হয়, ইংরেজ সেখানে অবিচল থেকে পরাজয়কে জয়ে পরিণত করবার চেষ্টা করে। কোনো বিপদেই তাদের স্তৈর্য আর কর্মশক্তিকে টলাতে পারে না।

তাই বিপ্লবীদের হাতে প্রথম ধাক্কায় সর্বত্র মার খেয়ে, ইংরেজরা তাদের সমস্ত শক্তি এক ক'রে, যে-সব সহর থেকে তারা বহিস্থৃত হয়েছিল, সেগুলো পুনরুদ্ধার করবার জন্যে বিপুল সমরায়েজন করলো। সমস্ত ভারতবর্ষকে ছ-ভাগে ভাগ ক'রে নিয়ে, ছ-দিক থেকে দুই বিচক্ষণ সেনাপতি অগ্রসর হলেন, অধিকৃত-সহরগুলিকে বিপ্লবীদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে। উত্তর-ভারতে স্থার কলিন ক্যাম্পেল বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং একে একে উত্তর-ভারতে সমস্ত সহর আবার দখল ক'রে নিলেন। বিপ্লবীরা খণ্ড খণ্ড ভাবে এই বিরাট বাহিনীর সামনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল; যুদ্ধের পর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা ক্রমশ উত্তর-ভারত থেকে মধ্য-ভারতের দিকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলো। এদিকে মধ্য-ভারতে স্থার হিউ রোজ বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন—যমুনা আর বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী সমস্ত অংশ দখল ক'রে নিয়ে স্থার কলিন ক্যাম্পেলের সঙ্গে ঘিলিত হবার জন্যে। এই দুই বিরাট বাহিনীর চাপে বিজ্ঞেহীরা মাঝখানে ফাঁদে প'ড়ে গেল।

একটার পর একটা সহর দখল করতে করতে স্থার হিউ রোজ ক্রমশ ঝঁসীর দিকে অগ্রসর হলেন। ওধারে উত্তরদিক থেকে স্থার কলিন ক্যাম্পেলও ঝঁসীর দিকে এগিয়ে আসছিলেন।

এই সময়ে ভয়ে বহু দেশী-রাজ্যের রাজা ইংরেজদের দলে যোগদান করলো। এবং বিপ্লবীদের দমন করবার জন্যে ইংরেজদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তার পুরস্কারও তারা পরে পায়।

স্থার হিউ রোজ ভেবেছিলেন ঝঁসীর রাণী বোধহয় বিনাযুদ্ধেই

তাঁর কাছে আভ্রসমর্পণ করবে। তাই তিনি রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর কাছে দৃত পাঠিয়ে আভ্রসমর্পণ দাবী করলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ, দরবারে রাজ্যের সমস্ত সর্দারদের ডেকে পাঠালেন। এই বিরাট ইংরেজ-বাহিনীর সঙ্গে তিনি কি ক'রে যুদ্ধ করবেন? সকলেই বিমর্শ, সকলের মুখ ভার।

ইংরেজ-দৃত পত্রের উত্তর চাইলো। উত্তর দিলেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ—‘মেরী বাঁসী দুঙ্গি নেহি! আমার বাঁসী আমি দেবো না।

সেই বীর-নারীর সেই আভ্রমর্যাদার বাঁগী ভারতের আকাশে-বাতাসে আজও পর্যন্ত সজীব হয়ে ঘূরে বেড়াচ্ছে...অবিনাশী বিদ্যুৎশক্তির মতন আজও ভারতের আকাশে ঝিলিক দিয়ে উঠছে—‘মেরী বাঁসী দুঙ্গি নেহি! ’

*

*

*

বাঁসীর দুর্গে আবার রণ-দামামা বেজে উঠলো! নারীর পোষাক পরিত্যাগ ক'রে রাণী লক্ষ্মীবাঈ আবার পুরুষ-সৈনিকের বেশে তাঁর সৈন্যদলের সামনে এসে দাঢ়ালেন।

অস্তঃপুরে তাঁর দু'জন সঙ্গীনী ছিল, কাশী আর মন্দিরা। তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতন এই দুই নারী সর্বদাই থাকতেন। আজ জাতির চরম আহ্বানে তাঁরা দু'জনও রাণীর পাশে সৈনিকের বেশে এসে দাঢ়ালেন।

উত্তর-ভারত থেকে বিপ্লবীদের তাড়িয়ে নিয়ে শ্বার ক্যাম্পেল দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু প্রতিপদে তিনি একজন অতি দুরন্ত বিপ্লবীর কাছ থেকে বাধা পাচ্ছিলেন—তান্ত্রিয়া টোপী। শত চেষ্টা করেও এই দুরন্ত বিপ্লবীকে তিনি ধরতে পারেন নি। এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তান্ত্রিয়া টোপী শেষমুহূর্তে কোথা দিয়ে

পঞ্চকন্যা

অদৃশ্য হয়ে যান, ইংরেজরা তার কোনো সন্ধানই পায় না। আবার কয়েকদিন পরে কোথা থেকে নতুন সৈন্য সংগ্রহ ক'রে অতর্কিতে রাত্রিতে ইংরেজ-বাহিনীর ওপর ঝড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর গতিবিধি, অবস্থান কিছুই ইংরেজরা সন্ধান ক'রে বার করতে পারে না। চারদিকে তারা ঘোষণা ক'রে দিয়েছে, জীবিত বা মৃত তান্ত্রিয়া টোপীর দেহকে যে এনে দিতে পারবে, সে একটা রাজ্য পুরস্কার পাবে। কিন্তু, কোথায় তান্ত্রিয়া টোপী? রাতারাতি সে-বিশ্ববী সাঁতার কেটে যমুনা পার হয়ে যায়; তবেও বিক্র্যের জঙ্গলে, যেখানে দিনেরবেলায় মাছুষ ঢোকে না, সে-অরণ্য সে হেঁটে পার হয়ে যায়। স্থার ক্যাম্পেলের সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে, কোথা থেকে কখন তান্ত্রিয়া টোপী এসে পড়ে, তিনি কিছুই ঠিক করতে পারেন না।

ঝাঁসীর রাজ-প্রাসাদে গোপনে এক সন্ধ্যাসী এসে দেখা ক'রে যান। সে-কথা রাণী ছাড়া আর কেউ জানে না। নিশ্চীথে অঙ্ককারে আবার তিনি ঝাঁসী থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। স্থির হয়, তান্ত্রিয়া টোপী আর রাণী লক্ষ্মীবাংল মিলিতভাবে স্থার হিউ রোজকে বাধা দেবে, ফাঁদে ফেলবে। স্থার হিউ রোজ যখন ঝাঁসী আক্রমণ করবেন, সেইসময় তান্ত্রিয়া টোপী পিছনদিক থেকে এসে আক্রমণ করবে। সন্ধ্যাসীর বেশে তান্ত্রিয়া টোপী, রাণী লক্ষ্মীবাংল-এর সঙ্গে আগামী সংঘর্ষের সমস্ত পরিকল্পনা ঠিক ক'রে আবার অদৃশ্য হয়ে যান।

রাণী লক্ষ্মীবাংল, স্থার হিউ রোজকে বাধা দেবার জন্যে প্রস্তুত হন।

*

*

*

১৮৫৮, ৬ই জানুয়ারী। মহাউ দখল ক'রে স্থার রোজ দক্ষিণ-

পঞ্চকন্যা

দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এলো হায়দ্রাবাদ, এগিয়ে এলো ভূপাল...হায় খণ্ড-বিখণ্ড ভারতবর্ষ !

সেখান থেকে রায়গড় দখল ক'রে কাণপুরে এলেন। কাণপুর দখল ক'রে ঝঁসীর দিকে অগ্রসর হলেন। ঝঁসী থেকে ১৪ মাইল দূরে শিবির ফেললেন। এমন সময় খবর পেলেন, তান্ত্রিয়া টোপী কোথা থেকে সৈন্য নিয়ে চারখারী-রাজার ছেট দখল ক'রে নিয়েছেন এবং সেখানে নতুন ক'রে সৈন্যদল গ'ড়ে তুলছেন। স্থার রোজের কাছে প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে নির্দেশ এলো, আগে চারখারী-রাজাকে তান্ত্রিয়ার হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে। স্থার রোজ বুঝলেন, এইভাবে ধূর্ত বিপ্লবী তান্ত্রিয়া টোপী তাঁকে ঝঁসী আক্রমণ থেকে বিরত করতে চান। স্থার হিউ রোজ তাই নিজের দায়িত্বে স্থির করলেন, আগে তিনি ঝঁসী আক্রমণ করবেন। কতদিনই-বা তাতে লাগবে ?

কিন্তু ঝঁসীর দিকে যতই অগ্রসর হতে লাগলেন, ততই দেখলেন, চারদিক থেকে লেলিহান অগ্নিশিখা তাঁকে অভ্যর্থনা করছে। রাণী লক্ষ্মীবাঁটি বিচক্ষণ সেনাপতির মত আদেশ দিয়েছেন, স্থার হিউ রোজের আগমন-পথের মধ্যে যেন একখণ্ড তৃণও সজীব না থাকে। তাই সমস্ত মাঠ, শস্যক্ষেত্র দাউ দাউ ক'রে জলছে। কোথাও এককণা খাদ্য নেই...চারদিকে দুঃ-ভূমি। একটিও গাছ জ্যান্ত দাঢ়িয়ে নেই যে, তার ছায়ায় কেউ দাঁড়াবে। স্থার হিউ রোজ বুঝলেন, তাঁর বিরাট বাহিনীর খাদ্য-সম্ভার নষ্ট করবার জন্যেই প্রতিপক্ষের এই আয়োজন। কিন্তু রাণী লক্ষ্মীবাঁটি, তোমার রণ-কৌশল জানা থাকতে পারে...কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে, সিদ্ধিয়ার ইংরেজ-ভক্ত শাসক, টেহুরীর নবাব, তারা তোমার স্বদেশবাসী হলেও, তারা ভারতবর্ষকে জানে না। তাই সেদিন তারা উদ্গ্ৰীব

পঞ্চকন্ত্র।

হয়ে খান্দসভার নিয়ে স্তাব হিউ রোজের বাহিনীকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এলো। এর পুরস্কার নিশ্চয়ই তারা ইংরেজের কাছ থেকে পাবে।

তাই সেই প্রথম ধাক্কা এড়িয়ে এসে স্তাব হিউ রোজ বাঁসীর নগর-প্রাচীরের বাইরে নগর অবরোধ ক'রে দাঢ়ালেন। বাঁসীর নগর-প্রাচীরের মধ্যে সহরে ঢোকবার জন্যে দশটা প্রধান দরজা ছিল, আর তাছাড়া চারটে গোপন খিড়কী-দরজা ছিল—গঙ্গাপতাগর খিড়কি, অ্যালিঘোলকি খিড়কি, স্বজনকি খিড়কি, সগর খিড়কি।

স্তাব হিউ রোজ দেখলেন, প্রত্যেক নগর-প্রবেশদ্বার সুরক্ষিত।

২৫শে মার্চ বাঁসীর দুর্গ থেকে ‘ঘনগর্জ’ গর্জন ক'রে উঠলো। বাইরে থেকে ইংরেজ-বাহিনী তার প্রত্যুত্তর দিলো।

আজ বাঁসীর ভেতরে প্রত্যেক সমর্থ পুরুষ, প্রত্যেক সমর্থ নারী তাঁর জন্মভূমি রক্ষার জন্যে এগিয়ে এসেছে। রাণী স্বয়ং সারা নগর আর দুর্গের মধ্যে প্রত্যেক ধাঁটি ঘুরে বেড়িয়ে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। তরুণীরা আজ বলয়-কক্ষন পরিত্যাগ ক'রে দুর্গের সৈন্যদের সাহায্য করবার জন্যে গোলা-বারুদ বহন করছে... আহত সৈন্যদের সেবার ভার তাঁরাই গ্রহণ করেছেন।

ঐতিহাসিক D. B. Parasnath এই যুদ্ধের বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। তাঁর লেখা থেকে এই বর্ণনা উদ্ভৃত করছি :

“২৫শে থেকে আসল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। ভয়াবহ যুদ্ধ। সারাদিন সারারাত ইংরেজ-বাহিনী দুর্গের ওপর গোলা-বর্ষণ ক'রে চললো। এক মুহূর্তেরও বিরাম নেই। সহরের চারদিকে গোলা এসে পড়ছে। পঞ্চাশ-ষাট পাউণ্ডের গোলা, দূর থেকে একটা টেনিস-বলের মত দেখাচ্ছে। দিনের বেলায় সূর্যের আলোর দরুণ

পঞ্চকন্ত্রা

তাদের জ্যোতি চোখে পড়ে না। কিন্তু সক্ষ্যার অঙ্ককার নেমে
আসার সঙ্গে সঙ্গে লাল রঙে সমস্ত আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেল।
ছ'দিক থেকে জ্বলন্ত আগুনের লাল-আভা ছুটে ছুটে চলেছে। সে
রক্ত-আলোয় রাত্রি যেন রক্তিম দিন হয়ে উঠেছে। সারারাত
এইভাবে চললো গোলাবর্ধণ।

২৬শে, ছপ্তুরের দিকে ইংরেজরা দক্ষিণ-দরজার প্রধান গোলন্দাজকে
নীরব ক'রে দিলো। অবিরত গোলাবর্ধণের ফলে দক্ষিণ-দরজা
ভেঙে পড়বার মতন হলো। কেউ সাহস ক'রে সেখানে আর এগিয়ে
যেতে পারে না। রাণী লক্ষ্মীবাঈ বিপদ দেখে, প্রধান গোলন্দাজ
গোলাম গৌসকে নির্দেশ দিলেন, দক্ষিণ-দরজা রক্ষা করতেই হবে।
বীর গোলাম গৌস পশ্চিম-দরজা থেকে ইংরেজ গোলন্দাজদের ওপর
আক্রমণ স্থুর করলেন এবং তিনবার চেষ্টা করবার পর তিনি ইংরেজ-
দের প্রধান গোলন্দাজকে নীরব ক'রে দিলেন। রাণী নিজের
বলয় খুলে গোলাম গৌসকে পুরস্কার দিলেন। সে-সম্মান বীর
মাথায় তুলে নিলেন।

এইভাবে ক্রমান্বয় পাঁচদিন চলেছে যুদ্ধ। ঝঁসীর নগর-প্রাচীর
তেমনি সবলে বাধা দিয়ে চলেছে ইংরেজ-বাহিনীকে। ‘ঘনগর্জ’
আর ‘ভবানীশক্তরের’ আক্রমণে ইংরেজ-বাহিনীর বহু সৈন্য হয়েছে
ভূতলশায়ী। সপ্তম দিনের দিন বামদিকে ছুর্গ-প্রাচীরের এক অংশ
ভেঙে পড়লো। সেইদিকে ইংরেজ-গোলন্দাজেরা ক্রমান্বয় গোলাবর্ধণ
করতে স্থুর করলো। সেই গোলার মুখে এগিয়ে গিয়ে ভগ-প্রাচীর
মেরামত করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। কিন্তু সেদিন রাত্রিতে এগারো
জন বীর-সৈনিক কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে সেই
ভগ-প্রাচীর মেরামত করতে লেগে গেল এবং প্রতাতের আগেই
মেরামত সম্পূর্ণ হয়ে গেল। বিশ্বিত ইংরেজ-সৈনিক দেখে, সেখান

ଥେବେ ଅଭାବେ ଆବାର ନତୁନ କ'ରେ ବର୍ଷଗ ସ୍ଵରୂପ ହେଁ ଗିଯେଛେ । ଅଷ୍ଟମଦିନେର ସକାଳବେଳା ଇଂରେଜ-ବାହିନୀର ଏକଟା ଅଂଶ ଦୁର୍ଗେର ଶକ୍ତର-କେଳା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ରେ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଵରୂପ କରିଲୋ । ତାଦେର କାହେ ଖୁବ ଭାଲୋ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଛିଲ । ମେହି ସନ୍ତେର ସାହାଧ୍ୟେ ତାରା କେଳାର ଭେତ୍ରକାର ପ୍ରୋଜନୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ-କେନ୍ଦ୍ରଗୁଲିର ମଧ୍ୟେ କେଳାର ଜଲେର ଆଧାର ଦେଖିତେ ପେଯେ ଗେଲ । ତଥନ ମେହି ଜଲେର ଆଧାରଗୁଲି ଧଂସ କରିବାର ଜଣ୍ଣେ ଉଠେ-ପ'ଡେ ଲାଗିଲେ । ଶକ୍ତର କେଳାତେଇ ଛିଲ ଦୁର୍ଗେର ଜଲେର ଆଧାର । ଇଂରେଜଦେର ଗୋଲାର ମୁଖେ କେଉ ଆର ଜଲେର କାହେ ଏହୁତେ ପାରେ ନା । ତଥନ କାମାନେର ମୁଖ୍ୟ ସୁରିଯେ ଗୋଲାମ ଗୌସ, ଯେ ଇଂରେଜ-ବାହିନୀ ଦୁର୍ଗେର ଦିକେ କାମାନ ଛୁଡ଼ିଲ, ତାକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେନ ଏବଂ କଯେକ ଘନ୍ଟାର ମଧ୍ୟେ ତାଦେର ନୀରବ କ'ରେ ଦିଲେନ । ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଟୀ ନିଜେ ଅକ୍ରାନ୍ତ-ଭାବେ ସମସ୍ତ ପରିଦର୍ଶନ କ'ରେ ବେଡ଼ାଛିଲେନ ଏବଂ ସଥନି ଯେଥାନେ ଯା ପ୍ରୋଜନ, ତାର ନିର୍ଦେଶ ଦିଲ୍ଲିଲେନ । କ୍ରମାୟ ଆଟଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରାର ଫଳେ ସୈନ୍ୟରା କ୍ରମଶ କ୍ରାନ୍ତ ହେଁ ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀର ଉଂସାହବାଣୀତେ ତାରା ତଥନ୍ତେ ସମାନେ ପ୍ରତି-ଆକ୍ରମଣ କ'ରେ ଚଲେଛିଲ ।

କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ସାରାକ୍ଷଣ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଟୀ ଦୂର ଦିକରେଖାର ଦିକେ ଚେଯେଛିଲେନ । ତାନ୍ତ୍ରିଯା ଟୋପୀର ସଙ୍ଗେ ତାର ପରାମର୍ଶ ଠିକ ହେଁଛିଲ ଯେ ତିନି ସଦି କଯେକଦିନ ଆକ୍ରମଣ ଆଟକେ ରାଖିତେ ପାରେନ, ତାହ'ଲେଇ ତାନ୍ତ୍ରିଯା ମେହି ସମୟେର ମଧ୍ୟେ ପେଚନଦିକ ଥେକେ ଏସେ ପ'ଡେ ଇଂରେଜ-ବାହିନୀକେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନ । ତଥନ ଇଂରେଜ-ବାହିନୀକେ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପରାଜିତ ହତେଇ ହବେ ।

ହଠାଂ ନବମ ଦିନର ଦିନ—ରାଣୀ ଯେ ଇନ୍ଦିତେର ଅପେକ୍ଷାଯ ଦୂରେ ଦିକେ ଚେଯେଛିଲେନ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଁ ଦେଖା ଦିଲୋ । ପେଚନଦିକ ଥେକେ ତାନ୍ତ୍ରିଯା ଟୋପୀ ତାର କଥାମତ ଏସେ ପଡ଼େଛେ । ଉଲ୍ଲାସେ ରାଣୀର ଅନ୍ତର ନେଚେ ଉଠିଲୋ ।

কিন্তু সে-উল্লাস বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। তাণ্ডিয়া টোপীর অতর্কিত আক্রমণের সন্তাবনার কথা একজন বিশ্বাসযাতক, ইংরেজ-সেনাপতিকে আগে থেকেই জানিয়ে দেয় এবং তার ফলে স্থার হিউ রোজ তাঁর বাহিনীর বৃহত্তর অংশ, তাণ্ডিয়া টোপীকে প্রতি-আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত করেই রেখেছিলেন। তাণ্ডিয়া টোপী এই প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভেবেছিলেন, গোপনে অতর্কিতে পেছনদিক থেকে ইংরেজ-বাহিনীর ওপর প'ড়ে তাদের বিধ্বস্ত করবেন, কিন্তু তার বদলে এক কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হলো তাঁকে। তাঁর মুষ্টিমেয় সৈন্য বেশীক্ষণ এই আক্রমণ সহ করতে পারলো না। পরাজিত হয়ে তাণ্ডিয়া টোপীকে আবার আত্মগোপন করতে হলো।

*

*

*

রাণী লক্ষ্মীবাঁটি যখন বুবাতে পারলেন তাণ্ডিয়া টোপী পরাজিত হয়ে আত্মগোপন করেছেন, তখন তাঁর শেষ আশা ভেঙে পড়লো। কিন্তু বাইরে সৈন্যদের সামনে তিনি বিন্দুমাত্র উদ্বেগ দেখালেন না ক্রমান্বয় এই ক'দিনের যুদ্ধের ফলে তাঁর বীর-সেনাদলের মধ্যে অনেকেই হতাহত হয়েছে, কিন্তু অবশিষ্ট যারা আছে, তারা সমান তেজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে চলেছে। তাণ্ডিয়া টোপীকে পরাজিত ক'রে স্থার হিউ রোজ দ্বিত্তী বেগে আবার ঝঁসী আক্রমণ করেন, কিন্তু কিছুতেই নগর-প্রাচীর ভেঙে নগরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারছিলেন না। বারবার ইংরেজ-সৈন্যরা মই দিয়ে নগর-প্রাচীরের ওপর উঠতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু গোলাম গৌসের তৌক্ষ্যদৃষ্টিতে তারা প্রত্যেকবারেই ধরা প'ড়ে গিয়েছে এবং সেইখানেই নিহত হয়েছে। এইভাবে ইংরেজ-সৈন্যদের মধ্যে লেফ্টেন্যান্ট ডিক্‌, মিক্লজন,

বোনাস ফ্রেস্ প্রত্যেকেই নামজাদা বড় অফিসর—ব্যক্তিগত বীরত্ব দেখাতে গিয়ে প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছে। স্থার হিউ রোজের সমস্ত আক্রমণের তীব্রতা সহ করেও ঝাঁসী অটল রইলো। বাইরে থেকে স্থার হিউ রোজ বুবতে পারেন না, সত্যিই রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর সৈন্যসংখ্যা কত এবং ঝাঁসীর দুর্গের প্রতিরোধ ক্ষমতাই বা কতটুকু !

এমন সময় ভেতর থেকে ফণ তুলে উঠলো বিষধর সাপ... বিশ্বাসঘাতক। বুন্দেলা-সর্দার ঠাকুর লালাজী—ঝাঁসীর ভেতর থেকে ইংরেজদের সাহায্যের জন্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বল চেষ্টার পর একদিন রাত্রিতে বিশ্বাসঘাতক বুন্দেলা-সর্দার নগর-প্রাচীরের বোরহাদরজা খুলে দিলো... দেখতে দেখতে সমুদ্রের ঢেউ-এর মত ক্ষিপ্ত ইংরেজ-বাহিনী রাত্রির অন্ধকারে ঝাঁসীর ভেতর প্রবেশ করলো এবং যে নির্মম হত্যাকাণ্ড সুরং হলো, তাতে সমগ্র নগর আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ বুবালেন, ইংরেজদের প্রতিরোধ করা আর কোন-মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু তাই ব'লে তিনি ইংরেজদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করবেন না। ঝাঁসী থেকে কোনোরকমে তাঁকে আত্মরক্ষা ক'রে পালাতে হবে, যেমন করেই হোক পেশওয়ার সঙ্গে তাঁকে মিলিত হতে হবে। কিন্তু এই শক্ত-প্লাবিত সহর থেকে তিনি পালাবেন কি করে ?

রাণী লক্ষ্মীবাঈ এক চরম দুঃসাহসিক ব্যবস্থা ঠিক করলেন। নিজে পুরুষের পোষাক প'রে, তাঁর প্রিয় অশ্বের ওপর উঠে বসলেন। এই ঘোড়াটিকে রাণী তাঁর নিত্য-সহচরের মতন ভালোবাসতেন। ঘোড়ায় উঠে বালক-পুত্র দামোদরকে পিঠে বেঁধে নিলেন। পঞ্চাশজন বীর-সৈনিক তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। তাদের পাশ, তাদের দেহে প্রাণ থাকতে, রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর অঙ্গ কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

পঞ্চকল্যাণ

ছুর্গের গোপন-দ্বার দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে তাঁরা নগর-প্রাচীরের
উত্তরদিকের এক তোরণে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে দেখেন,
ইতিমধ্যেই ইংরেজরা তাদের প্রহরী নিযুক্ত করেছে। প্রহরীরা
সঙ্গীন তুলে প্রথমত জিজাসা ক'রে উঠলো, কে যায় ?

বীর-নারী অকম্পিতকর্ত্ত্বে ব'লে উঠলেন, তেহৰীর নবাবের ফৌজ...
প্রহরী দ্বার ছেড়ে দিলো। কারণ, তেহৰীর নবাব ইংরেজদের
পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

নগর-প্রাচীরের বাইরে এসে লক্ষ্মীবাঙ্গ ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।
পেছনে বালক-পুত্র দামোদরকে নিয়ে সেই রাত্রির অন্ধকারে উদ্ধা-
বেগে তিনি ঘোড়কে ছুটিয়ে দিলেন। একশো দু'মাইল পথ অতিক্রম
ক'রে শক্তর নাগালের বাইরে তাঁকে যেতে হবে। যে-দেশে শিবাজী
জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানকার মাটিতে দুর্দিষ্ট মাওয়ালী-অশ্বারোহীরা
জন্মেছিল, সেই মাটি থেকেই সন্তুষ্ট হয়েছিল এই বীর মারাঠা-রমণী
—যিনি পিঠেতে একজন বালককে নিয়ে একাদিক্রমে একশো দু'মাইল
পথ এক রাত্রির মধ্যে পার হবার শক্তি ও সাহস রাখেন। এ-ধরনের
বীরত আজ যত্রের যুগে বিরল হয়ে এসেছে। কিন্তু ব্যক্তিগত বীরত্বের
যুগেও, রাণী লক্ষ্মীবাঙ্গ-এর এই নৈশ-অভিযানের তুলনা হয় না।

*

*

*

স্তার হিউ রোজের প্রধান লক্ষ্য ছিল, রাণী লক্ষ্মীবাঙ্গকে বন্দী
করা। কিন্তু নগর-প্রবেশের অল্পক্ষণ পরেই তিনি জানতে পারলেন,
সেই মারাঠা-নারী তাঁর প্রহরীদের চোখে ধূলো দিয়ে অশ্বারোহণে
নগর ত্যাগ ক'রে পালিয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনি লেফ্টেন্যান্ট
বোকারকে আদেশ করলেন, ড্রংগামী অশ্বারোহীদের নিয়ে রাণীকে
অল্পধাবন করতে...

ହାଜାର ହୋକ୍, ଶ୍ରୀଲୋକ...କତଦୂରୁଷ-ବା ଏଗ୍ରତେ ପାରବେ ? ସେମନ
କରେଇ ହୋକ୍ ତାକେ ଧରତେ ହବେ !

ଲେଫ୍‌ଟେନ୍ୟୁଟ ବୋକାର ବିହ୍ୟ-ବେଗେ ଛୁଟିଲୋ ରାଣୀ ଲଙ୍ଘୀବାଟିକେ
ଧରବାର ଜଣେ ।

ସାରାରାତ୍ରି ଅବିରାମ ଅଶ୍-ଚାଲନାର ଫଳେ ଭୋରବେଳା ରାଣୀ ‘ଭାନ୍ଦିଆର’
ନାମେ ଏକ ଗ୍ରାମେ ଏସେ ପୌଛୋଲେନ । ସେଥାନେ କଯେକ ମିନିଟେର ଜଣେ
ଥେମେ ସାମାନ୍ୟ କିଛୁ ଜଳଯୋଗ କ’ରେ ନିଲେନ । ତାରପର ଆବାର ଘୋଡ଼ା
ଛୁଟିଯେ ଦିଲେନ । କାନ୍ଧିର ବଡ଼ରାସ୍ତାର ଓପର ଏସେ ସଖନ ପଡ଼ିଲେନ, ତଥନ
ପେଛନେ ଦୂରେ ଦେଖେନ, ଧେଁଯାର କୁଣ୍ଡଳୀର ମତ ଧୂଲୋ ଉଠିଛେ । କ୍ରମକା ସେଇ
ଧେଁଯାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଯେନ ଏଗିଯେ ଆସତେ ଥାକେ । ରାଣୀ ବୁଝିଲେନ, ତାକେ
ଅରୁମରଣ କ’ରେ ଆସଛେ ଇଂରେଜରା । ସାରା ରାତ୍ରିର ପରିଶ୍ରମେର ଫଳେ
ଘୋଡ଼ାଗୁଲୋ ତଥନ କ୍ଲାନ୍ଟ ହେଁ ଏସେଛେ । ଅନ୍ଧକରଣ ପରେଇ ଅରୁମରଣ-
କାରୀଦେର ଚେହାରା ସ୍ପାଷ୍ଟ ଫୁଟେ ଓଠେ । ରାଣୀ ଲଙ୍ଘୀବାଟି ବୁଝିଲେନ, କ୍ଲାନ୍ଟ
ଘୋଡ଼ାଦେର ନିଯେ ଅରୁମରଣକାରୀଦେରିଂ ଆଗିଯେ ତିନି ଆର ସେତେ ପାରବେନ
ନା, ସୁତରାଂ ପେଛନଦିକ ଥିକେ ଆକ୍ରମଣ ନା ହେଁ, ସାମନାସାମନି ଆକ୍ରମଣ
କରାଇ ଶ୍ରେୟ । ରାଣୀ ଘୋଡ଼ାର ମୁଖ ଘୁରିଯେ ଦାଁଡାଲେନ, ତାକେ ଘିରେ ତାର
ରଙ୍କଦୀରାଓ ଯୁଦ୍ଧର ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଲୋ ।

ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ତୁ-ଦଲେ ସ୍ଵର୍ଗ ହେଁ ଗେଲ ହାତାହାତି ସୁନ୍ଦ ।
ଲେଫ୍‌ଟେନ୍ୟୁଟ ବୋକାର ନିଜେ ରାଣୀ ଲଙ୍ଘୀବାଟିକେ ଆକ୍ରମଣ କରଲୋ ଏବଂ
ଆୟାତ କରବାର ଜଣେ ହାତ ତୁଳିତେଇ ଲଙ୍ଘୀବାଟି-ଏର ଦୌର୍ଘ୍ୟ ତଳୋଯାରେ ତାର
ଦେହ ବିନ୍ଦ ହେଁ ଗେଲ । ବାଲିକାକାଳ ଥିକେ ନିଷ୍ଠାସହକାରେ ତିନି
ଶିଖେଛେନ ଅସି-ଚାଲନା ଆର ଅଶ୍ଵାରୋହଣ ।* ଆଜ ସେ-ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଯୋଗ-
ଲଗ୍ ଉପର୍ଦ୍ଧିତ ହଲୋ । ତାକେ ଧ’ରେ ନିଯେ ଯାବାର ଜଣେ ଲେଫ୍‌ଟେନ୍ୟୁଟ

* କଥିତ ଆଛେ, ରାଣୀ ଲଙ୍ଘୀବାଟି ଅଶ୍-ନିର୍ବାଚନେ ସେ-ୟଗେର ଏକଜନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଛିଲେନ ।

বোকার আর তাঁর সঙ্গে যে-কয়েকজন এসেছিল, তারা কেউ আর ফিরে গেল না। রাণীর অভূতরদের মধ্যে অনেকেও সেখানে ধরাশায়ী হলো। অবশিষ্ট লোকদের নিয়ে সেই অবস্থাতেই রাণী আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। মধ্যরাত্রিতে তিনি কালিতে প্রবেশ করলেন, সেখানে তখন নানাসাহেবের প্রতিনিধি রাওসাহেবের কেন্দ্র ছিল।

নিরাপদে প্রাসাদে প্রবেশ ক'রে ঘোড়া থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের পুতুলের মত হাড়গোড় ভেঙে প্রভৃতি-প্রাণ অশ্বরাজ প'ড়ে গেল। যেন তার প্রভুকে নিরাপদে পৌঁছে দেবার জন্মেই এতক্ষণ ধ'রে সে তার সর্বশক্তি সংহত ক'রে রেখেছিল। রাণী একান্তভাবে ঘোড়াটিকে ভালোবাসতেন। তৎক্ষণাৎ ত'জন অশ্বপালক দেকে তাদের ওপর তার সেবার ভার দিলেন।

সেকেন্দার শাহ বা প্রতাপসিংহের বাহনের নাম আমরা জানি, তাদের প্রভুর নামের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নামও আজপর্যন্ত বেঁচে আছে। কিন্তু রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর এই বাহনের নাম ইতিহাসে নেই। এইসব নামহীন মূক পশুর কৃতিত্ব দেখে সত্যিই বিস্মিত হয়ে যেতে হয়, তাদের প্রভুভক্তি, কর্তব্যনিষ্ঠা, সাহস আর শক্তি দেখে মনে হয় না যে, তারা মহুয়াহের পর্যায়ের খুব নৌচে।

*

*

*

কালিতে তিনজন বিপ্লবী-নেতা একসঙ্গে মিলিত হলেন—
লক্ষ্মীবাঈ, তান্ত্রিকা টোপী এবং রাওসাহেব।

রাওসাহেবের পায়ের কাছে নিজের তলোয়ারখানি খুলে রেখে রাণী লক্ষ্মীবাঈ বললেন, আমার স্বামীর পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়ে, আপনার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই তলোয়ার পুরস্কার পেয়েছিলেন। আপনি আজ সেই পেশওয়াদের প্রতিনিধি।

ତାଇ ଆପନାର ପାଯେର କାଛେ ଏହି ତଲୋଯାର ଆମି ଖୁଲେ ରାଖିଲାମ,
ଏହି ତଲୋଯାରେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଜ ଆପନାକେ ରାଖିତେଇ ହବେ ।

ସେଇ ତରଗୀ ମାରାଠା-ନାରୀର କଥାଯ ରାଓସାହେବେର ମନ ଆବାର
ଉଂସାହେ ଜେଗେ ଓଠେ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଟ୍ଟ ବଲେନ, ଆପନାର ସୈତ୍ୟ ଯା ଆଛେ, ତାଇ ନିଯେ ଆମି
ଯାବୋ ଝାଁସୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରତେ ।

ବାରବାର ପରାଜିତ ହୟେ ତାନ୍ତ୍ରିଆ ଟୋପୀଓ ନିରୁଂସାହ ହୟେ
ଏସେଛିଲେନ । ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଟ୍ଟ-ଏର ସଂପର୍କେ ଆବାର ତାଁର ମନେ
ପ୍ରତିଶୋଧ-ବାସନା ତୌର୍ବାବେ ଜଳେ ଓଠେ ।

ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଟ୍ଟ ନତୁନ କ'ରେ ସୈତ୍ୟଦଳ ଗ'ଡେ ତୁଳତେ ଲାଗଲେନ ।
ତାଁର ଅଛୁଟ୍ରେରଣ୍ୟ ବାନ୍ଦାର ନବାବ, ଶାହଗଡ଼େର ରାଜା ନିଜେଦେର ସୈତ୍ୟ
ନିଯେ ବିପ୍ଳବୀଦେର ପତାକାର ତଳାଯ ଆବାର ସମବେତ ହଲେନ । ସକଳେର
ପରାମର୍ଶମୂଳତ ତାନ୍ତ୍ରିଆ ଟୋପୀ ସେନା-ନାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହଲେନ ।

ସ୍ତାର ହିଉ ରୋଜକେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଓୟା ଚଲତେ ପାରେ ନା, କାରଣ,
ତାଁର ସଙ୍ଗେ ମିଲିତ ହବାର ଜଣେ ଇଂରେଜ-ସେନାପତି ଛାଇଟଳକ୍ ଦ୍ରତ
ଏଗିଯେ ଆସଛେନ । ଛାଇଟଳକ୍ ଆର ରୋଜ ମିଲିତ ହବାର ଆଗେଇ
ଝାଁସୀ ଆକ୍ରମଣ କରତେ ହବେ । ତାର ଜଣେ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ଅତି
ଦ୍ରତ ଶେଷ କ'ରେ ଫେଲତେ ହଲୋ । ସମୟଇ ହୟେ ଦାଁଡ଼ାଲୋ ସବଚୟେ
ପ୍ରାୟୋଜନୀୟ ଜିନିସ ।

ଏହିଭାବେ ଦ୍ରତ ସମର-ଆୟୋଜନ ଶେଷ କ'ରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଟ୍ଟ
ଆର ତାନ୍ତ୍ରିଆ ଟୋପୀ ଝାଁସୀର ଦିକେ ଅଗ୍ରସର ହଲେନ । କାନ୍ଧି ଥିକେ
୪୨ ମାଇଲ ଦୂରେ ‘କୁଁଚଗ୍ନୀଔ’ ନାମେ ଏକ ଗ୍ରାମେ ଉଭୟ ସେନାଦଳେର
ସାନ୍କାନ୍ତ ହଲୋ । ବିଚକ୍ଷଣ ସେନାପତିର ମତ ତାନ୍ତ୍ରିଆ ଟୋପୀ ତାଁର
ସୈତ୍ୟଦେର ଆଦେଶ ଦିଯେଛିଲେନ, ଦିନେର ବେଳାଯ ସଥିନ ଶୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ
ବାଡ଼ିବେ ସେଇମଯ ଇଂରେଜଦେର ଆକ୍ରମଣ କରତେ । କାରଣ, ଅଭିଭିତ୍ତା

থেকে তিনি দেখেছিলেন যে, ইংরেজ-সৈন্যরা সেই গরমের মধ্যে, যুদ্ধ করতে স্বভাবতই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

তাই পরের দিন বেলা দশটার পর তান্ত্রিয়া টোপীর বাহিনী, স্থার হিউ রোজের সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু যুদ্ধ কিছুক্ষণ অগ্রসর হতে-না-হতে রাণী লক্ষ্মীবাঁটি দেখলেন, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করার দরুণ তাদের বাহিনীর মধ্যে ভীষণ গোলমাল আর অব্যবস্থা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন সেনাদলদের নিয়ে এক পতাকার তলায় তাড়াতাড়ি সম্মিলিত করা হয়েছে বটে, কিন্তু উপর্যুক্ত শিক্ষার সাহায্যে তাদের সজ্জবদ্ধ ক'রে তোলার অবকাশ আর ঘটেনি। তাই প্রত্যেক দলই কিছুক্ষণ পরে স্ব-স্ব প্রধান হয়ে উঠলো। কার কথা কে মানবে, তাই নিয়ে রীতিমত গঙ্গগোল বেঁধে গেল। তান্ত্রিয়া টোপী সেনাপতি নির্বাচিত হওয়া সঙ্গেও তিনি দেখলেন, একসঙ্গে যুদ্ধ করার অভ্যাস না থাকার দরুণ তাঁর আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না। যুদ্ধের মধ্যে এই গঙ্গগোলের সংশোধন করা সম্ভব নয়। দেখতে দেখতে এই গঙ্গগোল এমন ভয়াবহ মাত্রায় ফুটে উঠলো যে, বিপ্লবী-সেনাদল একরকম নায়কশৃঙ্খলা হয়ে পড়লো। অর্থাৎ সকলেই নায়ক হয়ে উঠলো। অপরদিকে স্থার হিউ রোজের অধীন সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী বিপক্ষের ত্রিটির স্বয়েগ নিয়ে তাদের অচিরকালের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেললো। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কুচগাঁও-এর যুদ্ধ মীমাংসিত হয়ে গেল। বিপ্লবী-বাহিনী অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে গেল। তখন একমাত্র পথ, যত শীত্র সম্ভব কৌশলে রণক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে পালিয়ে যাওয়া। এই প্রত্যাবর্তনের সময় রাণী লক্ষ্মীবাঁটি অসাধারণ সামরিক-প্রতিভাব পরিচয় দেন, নতুবা সেদিন হয়তো একটিও বিপ্লবী-সেনা ফিরে

পঞ্চকন্যা

যেতে পারতো না। ইংরেজ-ঐতিহাসিক ম্যালেসন মুক্তকষ্টে এই প্রত্যাবর্তনের প্রশংসা ক'রে গিয়েছেন, সামরিক কৌশলের দিক থেকে এই প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বিপ্লবীদলের নায়কদের গৌরবের বস্তু হয়ে থাকবে।

রাণী লক্ষ্মীবাংল পরাজিত হয়ে কান্তিতে ফিরে এসে দেখলেন, তান্ত্রিয়া চৌপী ফিরে আসেননি। অনুসন্ধানের পর জানা গেল, তিনি ছদ্মবেশে চারখী-গ্রামে চলে গিয়েছেন তাঁর বৃন্দ পিতার সঙ্গে দেখা করতে। এইসময় হঠাৎ তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে তাঁর বৃন্দ পিতার সঙ্গে কেন দেখা করতে গেলেন, লক্ষ্মীবাংল বা রাওসাহেব কেউ-ই বুঝতে পারলেন না। তবে কি সেই দুর্বল বিপ্লবী বারবার পরাজয়ে ভগ্নোত্তম হয়ে যুদ্ধ ত্যাগ করলেন ?

রাওসাহেব কুঁচগাঁও-এর পরাজয়ে একেবারে ভেঙে পড়লেন। এ-হেন ক্ষেত্রে যা হয়, প্রত্যেক দল—অপর দলের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চেষ্টা করলো।

তাদের সকলকে শাস্তি ক'রে রাণী লক্ষ্মীবাংল বললেন, পরাজয় যখন হয়েছে, তার দায়িত্ব সমানভাবে সকলকেই নিতে হবে। আসল পরাজয়ের কারণ হলো, আমাদের বাহিনী সুনিয়ন্ত্রিত হয়নি তাড়াতাড়ি পাঁচমিশেলী লোক নিয়ে এই বাহিনী গঠন করার দরুণ কেউ কারুর অংশ সঠিকভাবে পালন করতে পারেনি !

সবাই যখন বিমর্শ, আশাহত, কেবলমাত্র এই তরংগী-নারী তখনও পর্যন্ত সমান উৎসাহে, সমান তেজে সামনের দিকে চেয়ে আছেন।

ভগ্নহৃদয় সৈন্যদের ডেকে তিনি বলেন, শক্তিতে আমরা ওদের চেয়ে কোনোমতেই কম নই; শুধু আমাদের সংগঠনের অভাবে আমরা মার খাচ্ছি। সুতরাং ভালোভাবে সংগঠন ক'রে আমরা

পঞ্চকন্তা

আবার আক্রমণ করবো...নিশ্চয়ই আমরা জয়লাভ করবো...পবিত্র
মাতৃভূমি থেকে ফিরিস্বীদের বিভাড়িত করবো।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর সেই অনিবার্য উৎসাহের শিখায় আবার
ধীরে ধীরে ভগ্নোচ্ছম-সৈন্যদের মনে আশার আলো জলে ওঠে।
রাওসাহেব বিশ্বায়ে সেই মারাঠা-রমণীর দিকে চেয়ে নিজেকে আবার
সজাগ ক'রে তুললেন। আজ বিশ্বায়ে পেছনের দিকে চেয়ে সেই
অসন্তুষ্ট ছর্য্যোগের মধ্যে একজন ভারত-নারীর সেই সর্ব-পরাজয়-
তুচ্ছকারী স্বদেশপ্রেম আর বীরত্বের কথা অরণ ক'রে অন্দায়
আপনা-থেকে মাথা নত হয়ে আসে। যে-দেশে রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর
মতন বীর-নারী জন্মগ্রহণ করে, সে-দেশের নারীশক্তির মধ্যে কি
মহাসন্তানা লুকিয়ে আছে, তা কে বলতে পারে?

কান্নির তাঁবুতে আবার রণ-দামামা বেজে উঠলো। রাণী
লক্ষ্মীবাঈ ঘোষণা করলেন, কুঁচগাঁও-এর পরাজয়ের প্রতিবিধান না
ক'রে আমরা কেউ ঘুমুবো না।

সত্যিই লক্ষ্মীবাঈ-এর অভ্যন্তরে সকলের মধ্যে এক সুবিপুল
সংগ্রামস্পৃষ্ঠা জেগে উঠলো। আগেকার ক্ষটির পুনরাবৃত্তি যাতে না
হয়, তার জন্যে রাণী লক্ষ্মীবাঈ বিশেষভাবে বিপ্লবী-বাহিনীকে শিক্ষা
দিতে লাগলেন। ওধারে স্তার হিউ রোজ কান্নি দখল করবার
জন্যে এগিয়ে আসছিলেন। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে,
পরাজিত বিপ্লবী-বাহিনী এত অল্প সময়ের মধ্যে তাকে উল্লেখযোগ্য
কোনো বাধা দিতে পারবে।

হঠাৎ ২০শে মে তাঁর বাহিনীর দক্ষিণদিকের ওপর বাহিনীর
মতন রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই
তীব্র আক্রমণের ফলে ইংরেজ-সৈন্যবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।
রাণী তাঁর দুর্দৰ্শ অশ্বারোহীদের নিয়ে ইংরেজ-গোলন্দাজ-সেনানীর

পঞ্চকুণ্ডা।

ওপর বাঁপিয়ে পড়লেন এবং একটির পর একটি কামান দখল ক'রে নিলেন। ভয়ে ইংরেজ-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে সুরু ক'রে দিলো। স্থার হিউ রোজ সেই আক্রমণের তীব্রতায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং পরম বিশ্বয়ে বুবাতে পারলেন, সামনেই সুনিশ্চিত পরাজয়। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ! মাঝুব সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে জয়ী হতে পারে, পারে না শুধু ভাগ্যের বিরুদ্ধে।

স্থার হিউ রোজ যখন দেখলেন, পরাজয় আর কিছুতেই আটকাতে পারেন না, তখন তাঁর শেষ সম্বল ছিল এক উদ্ধৃবাহিনী, তারই সাহায্য নিলেন। রাণীর সৈন্যরা তখন জয়োল্লাসে ইংরেজদের কচু-কাটা ক'রে এগিয়ে চলেছিল, তাদের সামনে স্থার হিউ রোজ দেড়শো উটকে এনে পথরোধ ক'রে দাঢ় করালেন। এই দেড়শো উট তাঁকে সুনিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে সেদিন বঁচালো। যুদ্ধের শেষ-মুখে সামনে সেই উটের প্রাচীরে রাণীর সৈন্যরা বাধা পেলো। ইত্যবসরে স্থার হিউ রোজ, পলাতক সৈন্যদের ফিরিয়ে নতুন ক'রে পাশ দিয়ে আবার আক্রমণ করলেন। সেই উটের প্রাচীর ভেদ ক'রে বিপ্লবী-সৈন্যরা আর এগুতে পারলো না। পাশ দিয়ে ইংরেজের কামান তাদের ওপর আবার গর্জন ক'রে উঠলো। সুনিশ্চিত জয়ের মুখে তাঁরা যে এমনভাবে বাধা পাবে তা আশা করেনি। ইংরেজের কামানের মুখে বেশীক্ষণ তাঁরা টিকে থাকতে পারলো না। দেখতে দেখতে বিপ্লবী-সেনাদলের মধ্যে ভাঙ্গন সুরু হয়ে গেল, ছত্রভঙ্গ হয়ে তাঁরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করলো। সেইদিনের কথা স্মরণ ক'রে একজন ইংরেজ-ঐতিহাসিক লিখেছেন, এই ঘটনার পর থেকে আমি উটদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করি।

বিজয়ী ইংরেজ-সৈন্য পলাতক-বিপ্লবীদের তাড়া ক'রে কাল্পনির দিকে অগ্রসর হলো এবং কাল্পনি দখল ক'রে নিলো। কিন্তু স্থার

হিউ রোজ বিস্তি হয়ে দেখলেন, বিপ্লবীদের মূল-নায়কদের মধ্যে কেউ-ই কান্তিতে ধরা পড়েনি। রাওসাহেব, তান্ত্রিয়া টোপী আর রাণী লক্ষ্মীবাটী কোথায় যে আত্মগোপন করেছেন, তার সন্ধান কেউ-ই পেলো না। তাঁদের না ধরতে পারলে এ-বিপ্লব কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না, তা স্থার হিউ রোজ জানতেন। কিন্তু কোথায় সেই দুর্দান্ত বিপ্লবীর দল? পরাজিত হয়েও যারা পরাজয় স্বীকার করবে না?

একান্তভাবে পরাজিত হয়ে রাণী লক্ষ্মীবাটী, রাওসাহেব, বান্দার নবাব কোনরকমে আত্মগোপন ক'রে গোপালপুরে এসে আবার সমবেত হলেন। আজ তাঁরা একান্তই সহায়-সম্বলহীন। রাজ্য নেই, সৈত্য নেই, দুর্গ নেই, অর্থ নেই, বারবার পরাজয়ে অন্তরেও নেই আশা আর উৎসাহ। ওধারে পরাজয়ের প্রধান ধাক্কা এড়িয়ে ইংরেজরা হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত সমস্ত রাজ্য আবার দখল ক'রে নিয়েছে। যে-কয়েকজন দেশী রাজা বিপ্লবীদের সাহায্য করতে পারতো, তারাও অবস্থা বুঝে ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করেছে। রাণী লক্ষ্মীবাটী আর রাওসাহেব সারা ভারতবর্দের দিকে চেয়ে দেখলেন, কোথাও তাঁদের দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই। এহেন নিদারণ দুরবস্থায় যে-কোনো লোকই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এমন-কি, রাওসাহেবের মনেও আত্মসমর্পণ করার কথা জেগেছিল, কিন্তু লক্ষ্মীবাটী সে-চিহ্ন পর্যন্ত মনে স্থান দিতে পারলেন না। যদি একজনও সঙ্গী পান, তিনি যুদ্ধ ক'রে প্রাণ বিসর্জন দেবেন, তবুও শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না। এই তেজ, এই সাহস, এই অটুট সঙ্কল্প, এক সুত্তর্ব বস্তুর মতন ভারতের ইতিহাসে চির-উজ্জ্বল হয়ে আছে। পরাজিত তাঁরা হয়ে-ছিলেন বটে, কিন্তু ইংরেজ তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়েও এই বীর-

পঞ্চকন্তা

নারীর অন্তরকে জয় করতে পারেনি। যেমন যুরোপে আর-একদিন তারা পারেনি, পরাজিত ‘জন অফ আর্ক’কে জয় করতে!

কি ক’রে ইংরেজের বিরুদ্ধে আবার সৈন্য-সংগ্রহ ক’রে দাঁড়ানো যায়, গোপালপুরে রাণী লক্ষ্মীবান্তি তারই চিন্তায় দিন অতিবাহিত করেন। একমাত্র ভরসা—তান্ত্রিয়া টোপী। তাঁরই মতন এই দুরস্ত বিপ্লবী ঘৃত্যকে বরণ করবে, তবুও ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করবে না। এই পণ নিয়ে তিনিও এই আন্দোলনে নেমেছিলেন। গেরিলা-যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর কৃতিত্ব দেখে বড় বড় ইংরেজ-সেনাপতিরাও বিশ্বিত হয়েছিলেন। শত চেষ্টা করেও তাঁরা তান্ত্রিয়া টোপীকে ধরতে পারেননি। কোথা দিয়ে, কখন কিভাবে যে এই যাত্রকর পালিয়ে যায়, তা তারা অহুমানও করতে পারে না। কিন্তু সেই তান্ত্রিয়া টোপীই-বা কোথায়? শেষসংবাদ যা পাওয়া গিয়েছিল, তাতে জানা যায় যে, তিনি ছদ্মবেশে তাঁর বৃন্দ পিতার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে গোয়ালিয়ারের দিকে গিয়েছেন। এই নিরাকৃণ যুদ্ধের মধ্যে সহসা তাঁর পিতৃভক্তি-বা হঠাতে এ-রকম বেড়ে উঠলো কেন?

আসল কথা, ধূর্ণ তান্ত্রিয়া টোপী ইংরেজদের গুপ্তচরদের বিভাস্ত ক’রে দেবার জন্যে ইচ্ছে করেই নিজের সম্বন্ধে এই সংবাদ প্রচার করেছিলেন। যুদ্ধ ছাড়া তাঁর মনে তখন অন্য আর কোনো চিন্তাই ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন, কাঞ্চির পতনের পর তাঁদের দাঁড়াবার জন্যে আর-একটা কোনো শক্ত ঘাঁটির প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর দৃষ্টি গোয়ালিয়ারের ওপর পড়ে। গোয়ালিয়ারের দুর্গ অত্যন্ত সুরক্ষিত। কোন রকমে সেই দুর্গ দখল করতে পারলে, তাঁরা আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুৱাতে পারেন। তাই ছদ্মবেশে তিনি গোয়ালিয়ারে প্রবেশ করেন। তিনি জানতেন, সেখানকার শাসক

—ইংরেজদের বন্ধু। কিন্তু সেখানকার জনসাধারণ এবং সর্দাররা, তাঁদের মনোভাব কি, তা জানা দরকার। ছদ্মবেশে গোয়ালিয়রে প্রবেশ ক'রে তিনি একে একে সর্দারদের সঙ্গে গোপনে দেখা করলেন এবং দেখলেন, তাঁরা অধিকাংশই বিপ্লবীদের দলে। তখন তিনি সংগোপনে প্রজাদের মধ্যে প্রচার কার্য্য স্থরু ক'রে দিলেন। সর্দাররা তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো। এইভাবে তাঁদের অঙ্গীকার নিয়ে ছদ্মবেশে তান্ত্রিয়া টোপী একদিন আবার গোপালপুরে এসে, রাণী লক্ষ্মীবাংল আর রাওসাহেবের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর মুখে সেই নতুন পরিকল্পনার আয়োজনের কথা শুনে রাণী লক্ষ্মীবাংল আবার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। যত দ্রুত সম্ভব গোয়ালিয়র দখল ক'রে নিতে হবে।

তান্ত্রিয়া টোপীর আয়োজনমত গোয়ালিয়রে প্রজারা বিপ্লব ঘোষণা ক'রে উঠলো। রাণী লক্ষ্মীবাংল, তান্ত্রিয়া টোপী সগর্বে প্রবেশ করলেন। জনতা বিপুল উল্লাসে তাঁদের গ্রহণ করলো। সিন্ধিয়া পূর্বাহে জানতে পেরে, পালিয়ে স্তার হিউ রোজের শরণাপন্ন হলো। স্তার হিউ রোজ দেখলেন, বিপ্লবীরা যদি গোয়ালিয়রে গুছিয়ে নিয়ে বসবার সময় পায়, তাহ'লে পরাজিত করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাই বিপ্লবীদের হাত থেকে গোয়ালিয়রকে উদ্ধার করবার পুণ্যত্ব নিয়ে স্তার হিউ রোজ কালবিলস্ব না ক'রে বিপুল-বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন।

নবগঠিত সৈন্যদের নিয়ে রাণী লক্ষ্মীবাংল এগিয়ে গিয়ে স্তার হিউ রোজকে বাধা দিলেন। গোয়ালিয়রের কাছে কেতোকীসরাই ; এর মাঠে তুমুল যুদ্ধ স্থরু হয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ্মীবাংল বুঝতে পারলেন, ইংরেজ-সৈন্যদের তুলনায় তাঁর সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত কম ! একমাত্র তাঁদের বীরত্বের ওপর নির্ভর ক'রে তাঁকে অগ্রসর

হতে হবে। সারাদিন সংগ্রাম হলো। পরের দিন ভোর হতেই ইংরেজ-বাহিনী চারদিক থেকে রাণী লক্ষ্মীবাটীকে ঘিরে ফেললো।

গতদিনের সংগ্রামে লক্ষ্মীবাটী-এর বহু সৈন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিল। নতুন সৈন্য না এলে এই অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে সেই বিরাট বাহিনীর সঙ্গে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করা আর সম্ভব হবে না। একমাত্র উপায়, প্রত্যাবর্তন করা। কিন্তু স্থার হিউ রোজ সে-পথও বক্ষ ক'রে আলাদা একদল সৈন্যকে মজুত রেখে দিয়েছিলেন। তাঁর আদেশ, যেমন করেই হোক, রাণী লক্ষ্মীবাটীকে এবার বন্দী করতে হবে। এবার যেন বাধিনী আর পালিয়ে না যেতে পারে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাণী লক্ষ্মীবাটী আতঙ্কিত হয়ে দেখলেন, তাঁর আশেপাশে তাঁর দলের মাত্র জন-কুড়ি অশ্বারোহী তখনও পর্যন্ত তাঁকে ঘিরে যুদ্ধ ক'রে চলেছে। এ-অবস্থায় আর রণক্ষেত্রে দাঢ়িয়ে থাকলে অবিলম্বেই তিনি শক্রদের হাতে বন্দী হয়ে পড়বেন। তখন সেই পরম ছঃসাহসিকা নারী মুক্ত অসিহস্তে শক্রব্যুহ ভেদ ক'রে বেরিয়ে পড়বার জন্যে অগ্রসর হলেন। তাঁর অমির আঘাতে ছ'ধারে ইংরেজ-হসার-বাহিনীর সৈন্যেরা ছিল্লদেহে প'ড়ে যেতে লাগলো। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে, ছ'পাশ দিয়ে, শেঁ-শেঁ শব্দে গুলী চলেছে। এমন সময় হঠাত তাঁর কানে এলো অন্তিম চীৎকার—বাটী-সাহেবা, আমি চললাম। লক্ষ্মীবাটী ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, তাঁর আজীবনের সহচরী বীর-নারী কাশী, শক্র গুলিতে বিন্দ হয়ে প'ড়ে গেলেন। তাঁকে ধরতে গিয়ে রাণীর দ্বিতীয় সহচরী মন্দার, তিনিও শক্র গুলিতে নিহত হয়ে রণক্ষেত্রে প'ড়ে গেলেন অঙ্গুশোচনার সময় নেই, দীর্ঘশাস ফেলবার অবকাশ নেই, রাণী লক্ষ্মীবাটী বড়ের মতন ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন! পাশে তাঁর দেহরক্ষী

ଗୁଡ଼ିକତକ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟଭୃତ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରାଓ ଦେଶମୁଖ...
ଏହି ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ଛାୟାର ମତ ରାଗୀର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚଲେହେନ ।

ଛ'ଧାରେ ଅସି-ହଜେ ପଥ ମୁକ୍ତ କ'ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଟୀ ବେରିଯେ ପଡ଼େନ ।
ଉକ୍କାବେଗେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟିଯେ ଦେନ । ତାକେ ଦେଖିତେ ପେଯେ ଏକଦଲ
ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ତାର ପିଛୁ ପିଛୁ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟିଯେ ଦିଲୋ । ବହୁଦୂର ଏସେ
ହଠାତ୍ ସାମନେ ଏକଟା ଛୋଟୀ ନଦୀ ପଡ଼ିଲୋ । ହାୟ, ଆଜ ଯଦି ତାର
ସେଇ ପୁରାତନ ବାହକ ଥାକତୋ । ରଣକ୍ଳାନ୍ତ ଘୋଡ଼ା କିଛୁତେଇ ସେଇ
ନଦୀଟିକୁ ଲାଫିଯେ ପାର ହତେ ଚାଇଲୋ ନା । ସତବାର ନଦୀର ଧାରେ
ଆସେ, ମୁଖ ସୁରିଯେ ନିଯେ ଗୋଲ ହୟେ ସୁରତେ ଥାକେ । ସେଇଟୁକୁ ସମୟେର
ମଧ୍ୟେ ଅନୁସରଣକାରୀର ଦଲ କାହେ ଏସେ ପଡ଼େ । ତଥନ ଅଗତ୍ୟା ରାଗୀ
ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଟୀ ତାର ଅନୁଚରଦେର ସମ୍ମୁଖ-ୟୁଦ୍ଧେ ଆହ୍ଵାନ କରତେ ବାଧ୍ୟ ହଲେନ ।
ସେଇ ବୀର ମାରାଠା ନାରୀର ଅସିର ଆଘାତେ ଏକେ ଏକେ ଅନୁସରଣକାରୀରା
ସୈନ୍ୟ ତାର ଦେହେ ସଜୋରେ ତଳୋଯାରେର କଠିନ ଆଘାତ କରିଲୋ । ଦ୍ଵିତୀୟବାର
ସେ-ଆଘାତ ରାଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଟୀ ଏଡ଼ାତେ ପାରିଲେନ ନା । ଦ୍ଵିତୀୟବାର
ଆଘାତେର ଜଣ୍ଣେ ଯେଇ ସେଇ ଇଂରେଜ-ସୈନ୍ୟ ତଳୋଯାର ତୁଲେହେ, ଅମନି
ଦେଶମୁଖ ଛୁଟି ଏସେ ତାର ଦେହ ଦ୍ଵିଧଣ୍ଡିତ କ'ରେ ଫେଲିଲୋ । ରାଗୀର
ଆହତ-ଅଙ୍ଗ ଦିଯେ ପ୍ରବଳ ଧାରାଯ ତଥନ ରକ୍ତପାତ ହଚ୍ଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ
ଅବସ୍ଥାଯ ତିନି ସମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ'ରେ ଚଲିଲେନ । ଅବଶ୍ୟେ ଅନୁସରଣ-
କାରୀରା ସକଲେଇ ସଥନ ନିହତ ହୟେ ପ'ଡ଼େ ଗେଲ, ତଥନ ରାଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଟୀ-
ଓ ଆର ଘୋଡ଼ାର ଓପର ବ'ସେ ଥାକତେ ପାରିଲେନ ନା । ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାନ୍ତିକ
ଆଘାତେ ତିନି ଘୃତପ୍ରାୟ ହୟେ ପ'ଡ଼େ ଗେଲିଲେନ । ଯେ କଯେକଜନ ଅନୁଚର
ଜୀବିତ ଛିଲ, ତାରା ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ନଦୀର ଜଳ ନିଯେ ଏସେ ମୁମ୍ବୁ
ରାଗୀର ସେବା କରତେ ଆରଣ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ ରାଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଟୀ ବୁଝିତେ
ପାରେନ, ତାର ଅନ୍ତିମ-ଲଗ୍ନ ଏଗିଯେ ଏମେହେ !

পঞ্চকন্যা

দেশমুখকে ডেকে বলেন, বন্ধু, আমার অস্তিম-মিনতি...আমার
দেহ যেন শক্ররা স্পর্শ করতে না পারে !

তারা ধরাধরি ক'রে তাঁর রক্তাঙ্গ-দেহ নদীর ওপারে নিয়ে
যায়। নদীর ওপারে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ বুজে আসে...
দেহ হিম হয়ে যায়...

সংগ্রাম শেষ।

পাশের বন থেকে শুকনো ডাল আর ঘাস সংগ্রহ ক'রে
এনে যত্য-সহচর সেই কয়েকজন বীর-অনুচর সেখানে চিতা রচনা
করেন। সেই অখ্যাত নদীর কূলে, মুক্ত আকাশের তলায়, রাণী
লক্ষ্মীবাংলা-এর পুণ্য-দেহ শক্রর স্পর্শের অতীত-লোক চলে গেল !

শান্ত হলো অশান্ত অন্তর ! রণক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরে গেল
যোদ্ধা...সকল যোদ্ধার বাঞ্ছিত-ধারে...অমৃত-লোকে !

রাণী লক্ষ্মীবাংলা, তোমার পুণ্য-স্থানির বেদীমূলে আজ তার প্রণাম
রেখে গেল বাংলার এক সামান্য লেখক।

যত্যর ওপার থেকে তোমার আশীর্বাদ পাঠিও, তোমার দেশে
আজ যারা নারী হয়ে স্বাধীন-ভারতের পতাকার তলে সমবেত
হয়েছে, তাদের ওপর !

আমার কথা এইখানেই শেষ হলো।

যাবার মুখে শুধু এই কথাটাই আপনাদের ব'লে যেতে চাই,
নারীস্বাধীনতার ছবি দেখবার জন্যে, ভারত থেকে মুখ বাঢ়িয়ে
যুরোপের দিকে চেয়ে থাকবার দরকার নেই।

ইতিহাসের পাতা অমর ক'রে রেখেছেন রাণী লক্ষ্মীবাংলা.....
বন্দে মাতৰম্।

মালবদেশের বিদ্রোহ দমন করিয়া মহারাষ্ট্র-অধিপতি বাজীরাও পেশোয়ারের সেনাপতি, ইন্দো-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মল্হররাও হোলকর পুণ্যায় ফিরিতেছিলেন। পথে পাথরডী নামে এক গ্রামে বিশ্রামের জন্যে তিনি সৈন্যে তাঁবু ফেলিলেন। সন্ধ্যাকালে বৌর সেনাপতি মল্হররাও হোলকর পাথরডীর মন্দিরে আরতি দেখিতে গিয়া শুনিলেন, একটি বালিকা স্তোত্রপাঠ করিতেছে। সেই নবম-বর্ষায় বালিকার বিশুদ্ধ বেদ-স্তোত্রপাঠ শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বালিকা সুন্দরী নয়, কিন্তু মুখে এক অপূর্ব শ্রী। মল্হররাও পরিচয় লইয়া জানিলেন যে, বালিকাটি পাথরডী গ্রামের একজন সামাজিক কৃষিজীবীর কন্যা। কন্যার পিতা আনন্দরাও শিন্দে একজন অতি ধর্মনির্ণয় ব্যক্তি এবং তিনি স্বীয় জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষিকার্য করিতেন। কন্যাটির নাম অহল্যাবাঙ্গ।

বহুদিন অপূর্বক থাকিবার পর ১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন এই কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তখন এক জ্যোতিষী হাত দেখিয়া বলেন যে, এই কন্যা কালে রাজ-রাজেশ্বরী হইবে। স্নেহশীল পিতার অন্তর জ্যোতিষীর কথায় বিশ্঵াস স্থাপন করিয়া কন্যাকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

মল্হররাও কন্যাটির বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে আপনার পুত্রবধূ করিয়া জ্যোতিষীর বাক্যকে সফল করিতে চাহিলেন। মল্হররাও-এর প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দরাও তখনি সম্মত হইলেন এবং একদিন

ଶୁଭକ୍ଷଣେ ଇନ୍ଦୋର-ରାଜବଂଶେର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଲ୍ହରରାଓ ହୋଲକରେର ପୁତ୍ର ଖାଣେରାଓ-ଏର ସହିତ ନବମ-ବର୍ଷୀୟା ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗେ-ଏର ଶୁଭ-ବିବାହ ହଇଯାଇଲା । ଯେ ଅନ୍ତଃପୁରେ ଚତୁର୍ଦିକେ ସେଦିନକାର ଭାରତେର ଭାଗ୍ୟ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣେର ଶକ୍ତିପୁଣ୍ଡ ବାତାସେ ଘୁରିଯା ବେଡ଼ାଇତେଛିଲ, ସେଇ ଅନ୍ତଃପୁରେ ରାଜବ୍ୟକୁଳପେ ସାମାନ୍ୟ କୁଦିଜୀବିର କଣ୍ଠା ପ୍ରବେଶ କରିଲେନ ।

ଯଦିଓ ସେଦିନ ମଲ୍ହରରାଓ ହୋଲକରେର ଶକ୍ତିର ଉପର ସମଗ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତି ତଥା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଧେର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିତେଛିଲ, ତବୁଓ ମଲ୍ହରରାଓ ସ୍ଵୟଂ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଦରିଜ ବଂଶେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ତାହାଦେର ଆଦିମ ବାସ ଯେ ଗ୍ରାମେ, ତାହାର ନାମ ‘ହୋଲ’; ଏଇଜଟ ତାହାର ଆପନାଦେର ହୋଲକର (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଷାଯ କର ମାନେ ଅଧିବାସୀ) ବଲିଯା ପରିଚୟ ଦିତେନ ।

ଇନ୍ଦୋର-ରାଜବଂଶେର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାଲ୍ୟ ପଣ୍ଡ ଚାଇତେନ ଏବଂ ତାହାଇ ଛିଲ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଉପଜୀବିକା । ଆପନାର କ୍ରମତା ଓ ଅପୂର୍ବ ଶୌର୍ଯ୍ୟେର ବଲେ ତିନି କ୍ରମଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର-ଅଧିପତି ବାଜୀରାଓ ପେଶୋଯାରେର ସୈଗ୍ରମ୍ୟଗୁଣୀର ଏକଜନ ସାମାନ୍ୟ ଦୈନ୍ୟ ହିତେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ହନ । ସେଇ ସମୟ ମୋଗଲ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତେର ଏକାଧିପତ୍ୟ ଲଇଯା ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ବାଧିଯାଇଛେ । ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ-ଭାରତେ ସଥନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରେର ଶକ୍ତିର ନିକଟ ଦିଲ୍ଲୀଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହିତେ ବସିଯାଇଛେ, ତଥନ ଓଧାରେ ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ ହିତେ ଆହ୍ମେଦ ଶାହ, ଆବଦାଲି ପାଞ୍ଚାବ ଆକ୍ରମଣ କରିଯାଇଛେ । ସମଗ୍ର ଭାରତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରେର ଦିକେ ଏକଦୃଷ୍ଟେ ଚାହିଯାଇଛେ, ଯଦି ଏହି କାତ୍ରଶକ୍ତି ପୁନରାୟ ଭାରତେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁସାତ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିତେ ପାରେ । ବାଜୀରାଓ ପେଶୋଯାର ମଲ୍ହରରାଓ-ଏର ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିତେ ଗ୍ରୀତ ହିଯା ଏକ ଏକଟି ବିଜୟେର ପର ତାହାକେ ଏକ ଏକଟି କରିଯା ଜାଯଗୀର ଦାନ କରିତେ ଥାକେନ । ମାଲବ-ବିଜୟେର ପର ମଲ୍ହରରାଓ ହୋଲକର ସମଗ୍ର ଇନ୍ଦୋର ପ୍ରଦେଶ ଜାଯଗୀର ସ୍ଵରୂପ ଉପହାର ପାନ ।

ଅବଶେଷେ ୧୭୬୧ ଖୃତୀରେ ଭାରତେର ଭାଗ୍ୟ-ନିୟମ୍ଭା ନିର୍ମାପଣେର ଜନ୍ମ ପାଣିପଥେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଆହ୍ମେଦ ଶାହ୍ ଆବଦାଲିର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ । ଉହାଇ ତୃତୀୟ ପାଣିପଥ ସୁନ୍ଦର ନାମେ ଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତି ପରାଜିତ ହଇଯା ଏକେବାରେ ଭାଙ୍ଗିଯା ପଡ଼େ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର-ନାୟକଦେର ମଧ୍ୟ ତଥନ ଆଉ-କଲହ ଦେଖା ଦିଯାଛେ । ଶକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରେ ଉଠିଯା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତି ଆଉ-କଲହେର ଫଳେ ସେଇ ଯେ ପଡ଼ିଲ, ଆର ଉଠିତେ ପାରିଲ ନା । ମଲ୍ହରାଓ ହୋଲକର କୋନ୍ତ ଉପାଯେ ଆଭାରକ୍ଷା କରିଯା ଆପନାର ରାଜ୍ୟ ପଲାଇଯା ଆସେନ ।

ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗ ସାମାଜିକ କୃଷିଜୀବିର ସର ହିତେ ଏକେବାରେ ଭାରତେର ଭାଗ୍ୟ-ନିୟମ୍ଭାଦେର ଗୃହେ ଆସିଯା କିନ୍ତୁ ଦିଶାହାରା ହଇଯା ପଡ଼ିଲେନ ନା । ତିନି ଶ୍ଵଶୁର ଓ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିଭାଶାଲିନୀ ଓ ବହୁ ସଦ୍ଗୁଣମୟୀ ଶଙ୍କମାତା ଗୌତମବାନ୍ଦୀ-ଏର ନିକଟ ହିତେ ସଥାକ୍ରମେ ରାଜଧର୍ମ ଓ ହୃଦୟ-ଧର୍ମେର ସକଳ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗ-ଏର ବୟସ ସଥନ ମାତ୍ର ଆଠାରୋ ବ୍ୟସର, ସେଇ ସମୟ କୁଣ୍ଡରୀ-ତୁର୍ଗ ଅବରୋଧକାଳେ ସ୍ଵାମୀ ଖାଣ୍ଡରାଓ ସୁନ୍ଦର ନିହତ ହନ । ନିଦାରଣ ଶୋକେ ମର୍ମାହତା ହଇଯା ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗ ସ୍ଵାମୀର ସହିତ ସହମରଣେ ଯାଇବାର ମନସ୍ଥ କରିଲେନ । ଚିତା ପ୍ରକ୍ଷ୍ଵତ ହଇଲ । ସେଇ ସମୟ ସୁନ୍ଦର ମଲ୍ହରାଓ କାନ୍ଦିଯା ଫେଲିଲେନ । ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗ ଆପନାର ସେବା-ଧର୍ମେ ମଲ୍ହରାଓ-ଏର ପରିବାରେର ଚିତ୍ତ, ବିଶେଷ କରିଯା ସୁନ୍ଦର ସୈନିକଟିର ଚିତ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଜୟ କରିଯା ଫେଲିଯା- ଛିଲେନ । ସାଙ୍ଗନେତ୍ରେ ମଲ୍ହରାଓ ଚିତାର ସମ୍ମୁଖେ ଦ୍ଵାଢାଇଯା ପୁତ୍ରବ୍ୟକେ ସମ୍ବେଦନ କରିଯା ବଲିଲେନ, “ମା, ଖଣ୍ଡଜୀ ଆମାକେ ତ୍ୟାଗ କରିଯା ଗିଯାଛେ । ତୁମିଓ ଯଦି ଆମାକେ ତ୍ୟାଗ କର, ତାହା ହଇଲେ ସୁନ୍ଦରତ୍ୟାର ପାତକୀ ହଇବେ ।” ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗ-ଏର ଚିତାରୋହନ ଆର ହଇଲ ନା ।

ମଲ୍ହରାଓ ଟିକ କରିଲେନ ଯେ, ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗ-ଏର ଚିତକେ ବ୍ୟାପ୍ତ ରାଖିବାର ଜନ୍ମ ତାହାକେ ଦିଯାଇ ଏହି ରାଜସ୍ତାନ-ଶାସନ-କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲାଇତେ

হইবে। ধীরে ধীরে মল্লরাও সেই আঠারো বৎসরের বিধবাকে রাজকার্যের এক একটি দুরাহ কর্তব্য দিয়া তাঁহাকে ভারতের অন্ততম সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যক্তি করিয়া তুলিলেন। ক্রমশ রাজ্যের আয়-ব্যয়, হিসাব-রক্ষা ও পর্যবেক্ষণ, রাজ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা, সৈন্যবিভাগের উন্নতিসাধন, ব্যয়-নির্ধারণ, কর্মচারী নিয়োগ ও অপসারণ, রাজ্যের আয়ের ক্ষতি-বৃদ্ধি নির্ধারণ, এই সমস্ত দুরাহ ও জটিল রাজকার্যের ভার, যাহা অন্ততঃ তিন-চারিটি মন্ত্রীর কর্তব্য, তাহা এক। অহল্যাবাঙ্গি আশ্চর্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পূর্ণ করিতে লাগিলেন। অবশ্যে মল্লরাও ইন্দোর-রাজ্য পরিচালনের সমস্ত ভার অহল্যাবাঙ্গি-এর উপর দিয়া স্বয়ং বাফগাঁও নামক একস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজ্যের ভার লইয়াই অহল্যাবাঙ্গি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত আয়-ব্যয় হিসাব করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের আয় বাড়াইয়া তুলিলেন। রাজকার্য পরীক্ষা দ্বারা অহল্যাবাঙ্গি স্বয়ং মল্লরাও-এর বহু ভুল-ক্রটি পর্যন্ত বাহির করিলেন। পাণিপথের যুদ্ধের সময় মল্লরাও অহল্যাবাঙ্গি-এর উপর সমগ্র রাজ্যের ভার দিয়া যুক্তক্ষেত্রে যাত্রা করেন।

পাণিপথ-যুদ্ধে সেই শোচনীয় পরাজয়ের পর মল্লরাও আর মাত্র চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুত্রবধূ এবং একটি অল্পবয়স্ক পৌত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

তখন ইন্দোর-রাজ্যের চারিদিকে শক্র। সেই অবস্থায় অহল্যাবাঙ্গি স্বীয় অল্পবয়স্ক পুত্র মালেরাওকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং রাজ্য-চালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অহল্যাবাঙ্গি-কে চিরকাল আপনার অন্তরের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করিয়া অন্তরে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বাহিরে স্বের্য্য বজায় রাখিতে হইয়াছে। অন্তরের গীড়ায় যখন মন শতছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বাহিরে তখন বিন্দুমাত্র অধীরতা নাই।

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠୀ

ବୌବନେର ପ୍ରାରମ୍ଭେ ବୈଧବ୍ୟକେ ବରଣ କରିତେ ହିଲ ; ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀରେର ଅଛୁରୋଧେ ସହମରଣ ଘଟିଲନା, ମେହି ଶ୍ରୀରେ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁ-ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ଷକ୍ଷେ ଫେଲିଯା ଦିଯା ପରଲୋକ ଗମନ କରିଲେନ । ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର—କିନ୍ତୁ ମେ-ପୁତ୍ରେର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରେ ଓ ପାପାଚରଣେ ମାତୃହନ୍ଦରୀର ବିଷାକ୍ତ ହିଯା ଉଠିଲ । ମେ କାହିଁନୀ ପରେ ବଲିତେଛି ।

ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗି ତାର ଏକମାତ୍ର କଣ୍ଠା ମୁକ୍ତାବାଙ୍ଗି-ଏର ବିବାହ ଦିଲେନ । ମୁକ୍ତାର ଏକଟି ପୁତ୍ରକେ ତିନି ସର୍ବଦାଇ ତାହାର ନିକଟେ ରାଖିତେନ । ମେହି ବାଲକଟିର ଉପର ତାହାର ଅନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ନିରମ୍ଭ-ମେହ ବର୍ଷିତ ହିତ ; କିନ୍ତୁ ମେହି ବାଲକ କିଶୋରକାଳ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହିତେ ନା ହିତେଇ ଅକାଳେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଲ । ତାହାର କିଛୁଦିନ ପରେ ମୁକ୍ତାବାଙ୍ଗି ବିଧବୀ ହିଲେନ । ସ୍ଵାମିପୁତ୍ର-ଶୋକାତୁରା ମୁକ୍ତା ବେଦନାୟ ଆଜାହାରା ହିଲେନ ଏବଂ ସ୍ଵାମୀର ଅଳୁଗମନ କରିବେଳ ସ୍ଥିର କରିଲେନ । ସଂମାର-ବନ୍ଧନହାରା ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗି ସାକ୍ଷରତ୍ୟନେ କଣ୍ଠାକେ ଚିତାରୋହଣେ ଘାଇତେ ନିଷେଧ କରିଲେନ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତାବାଙ୍ଗି ମାତାର ମେ-ଆବେଦନ ଶୁଣିଲେନ ନା । ନର୍ମଦାର ତୀରେ ସ୍ଵାମୀର ପାର୍ଶ୍ଵ ମୁକ୍ତାର ଚିତା ସଜ୍ଜିତ ହିଲ । ମାତା ଦେଖିଲେନ, କଣ୍ଠା ଚିତାରୋହଣ କରିତେଛେ । ଶୋକେ ଉନ୍ମାଦ ହିଯା ମେହି ଜଳନ୍ତ ଚିତାର ମଧ୍ୟେ ତିନି ଝାଁପ ଦିତେ ଘାଇତେଇ, ଦୁଇଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହାକେ ଧରିଯା ଫେଲିଲ । ନର୍ମଦାର ତୀରେ ଚିତାଗ୍ନି ସତୀର ପୁଣ୍ୟଦେହକେ ଭୟେ ପରିଗମ କରିଯା ଫେଲିଲ । ମୁକ୍ତାବାଙ୍ଗି ସେଥାନେ ସ୍ଵାମୀର ସହିତ ସହମରଣେ ଚିତାରୋହଣ କରିତେଛିଲେନ, ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗି ସେଥାନେ ଏକଟି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରେନ । ନର୍ମଦାର ତୀରେ ମେହି ମର୍ମର-ଚିତ୍ତ ଅପତ୍ୟ-ମେହେର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତୀକସ୍ତରପ ଆଜି ବିରାଜ କରିତେଛେ ।

ବାହିରେ ସଥନ କଠୋର ହଞ୍ଚେ ରାଜ୍ୟଚାଲନା, ଯୁଦ୍ଧ-ବିଗ୍ରହେର ବ୍ୟାପାରେ ଆଜାନିଯୋଗ କରିତେ ହିତେଛିଲ, ଏମନକି, ସହଞ୍ଚେ ଅସି ଧରିଯା ରଣଙ୍ଗନେ ନାମିତେ ହିତେଛିଲ, ଅନ୍ତରେ ମେହିମଯ ବନ୍ଧିତ-ମେହେର କୁଧା

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠୀ

ଶତ-ଶିଖାୟ ସମସ୍ତ ନାରୀ-ହୃଦୟକେ ପୁଡ଼ାଇୟା ଅନ୍ଦାରେ ପରିଗତ କରିତେଛିଲ । ଅଥଚ ଅନ୍ତରେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ ସଂଘର୍ଷ କୋନ୍ତା ଦିନ ବାହିରେ କାର୍ଯ୍ୟକେ ବିଶ୍ଵାସିତ କରିତେ ପାରେ ନାହିଁ । ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗ ଅନ୍ତରେ ଛିଲେନ ମୁକ୍ତକାମ ତାପସୀ-ରମଣୀ, ବାହିରେ ଛିଲେନ ସନ୍ତ୍ରାଜୀ ।

ୟୁବକ ମାଲେରାଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୂର ପ୍ରକୃତିର ଛିଲେନ । ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗ ଭାବିଯାଛିଲେନ ଯେ, ସିଂହାସନେ ବସିଲେ ହୟତୋ ପୁତ୍ରେର ଚରିତ ସଂଶୋଧିତ ହିବେ । କିନ୍ତୁ ସଂଶୋଧିତ ହେଉଥା ଦୂରେ ଥାକୁକ ମାଲେରାଓ-ଏର ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ପାପାଚରଣ ଦିନ-ଦିନ ବୁନ୍ଦି ପାଇତେ ଲାଗିଲ ସିଂହାସନେ ଆରୋହଣ କରିଯାଇ ତିନି ବିଶେଷଭାବେ ମତ୍ତପାନ ଆରଣ୍ଟ କରିଲେନ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସୁରାତେ ଅଚୈତନ୍ୟ ହେଉଥା ଥାକିତେନ ମତ୍ତାବସ୍ଥାୟ ତିନି କିନ୍ତୁ ହେଉଥା ରାଜକର୍ମଚାରୀଦିଗକେଓ ବେତ୍ରାଧାତ କରିତେନ । ମଲ୍ହରାଓ-ଏର ବୁନ୍ଦ ଆୟୁଷ ତୁକୋଜୀ ହୋଲକର ଏକବାର ମାଲେରାଓକେ ଉପଦେଶ ଦିତେ ଯାନ । ମାଲେରାଓ ତାହାକେ ଭୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନ କରାଇୟା ତାଡ଼ାଇୟା ଦେନ । ପୁତ୍ରେର ବ୍ୟବହାରେ ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗ-ଏର ଅନ୍ତରେ ଏକେବାରେ ଭାଙ୍ଗିଯା ପଡ଼ିଲ । ତିନି ଦେବ-ଦିଜ-ସେବାୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ନର୍ତ୍ତଦାର ତୌରେ ଅତିବାହିତ କରିବେଳ ସ୍ଥିର କରିଲେନ, କିନ୍ତୁ ତାହାତେଓ ମାଲେରାଓ ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗ ବ୍ରାନ୍ଦନିଦିଗକେ ଦେବତାର ଆୟ ପୂଜା କରିତେନ ଏବଂ ସର୍ବଦାଇ ଦାନେ ତାହାଦିଗକେ ସନ୍ତୃଷ୍ଟ କରିତେନ । ମାଲେରାଓ ଏହି ବ୍ରାନ୍ଦନିଦିଗକେ ନାନା ପ୍ରକାରେ କଷ୍ଟ ଦିତେନ । ବ୍ରାନ୍ଦନିଦିଗକେ ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ କରିବାର ଜନ୍ମ ତିନି ନିତ୍ୟ ନତୁନ ଉପାୟ ଉତ୍ତାବନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । କଥନେ ଦେଯ-ବସ୍ତ୍ରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଅଥବା କଳମେର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଜୀବନ୍ତ ବୁଣ୍ଡିକ ରାଖିଯା ବ୍ରାନ୍ଦନିଦିଗକେ ତାହାଇ ଦାନ କରିତେନ । ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପରିତେ ଗିଯା କତ ନିରୀହ ବ୍ରାନ୍ଦନିଦିଗକେ ଦଂଶନେ ଜର୍ଜିରିତ ହେଇୟାଛେନ, କତ ବ୍ରାନ୍ଦନ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଯାଛେନ, ସୁରାୟ ଉନ୍ମାଦ ମାଲେରାଓ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଯା ଆନନ୍ଦେ

ପଞ୍ଚକଣ୍ଠ

କରତାଲି ଦିତେନ, ଆର ଏହି ସମସ୍ତ ସଂବାଦେ ତାପମୀ ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗୀ-ଏର ଅନ୍ତର ଯେ କି ଭାବେ ବିଚଲିତ ହିତ, ତାହା ବଲାଇ ବାହଳ୍ୟ ।

ଏକବାର ମାଲେରାଓ ଏକଜନ ଶିଳ୍ପୀକେ ସନ୍ଦେହକ୍ରମେ ହତ୍ୟା କରେନ । କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାନିତେ ପାରେନ ଯେ, ଲୋକଟି ସତ୍ୟଇ ନିରପରାଧ । ସେଇ ସଟନାର ପର ତିନି ଶୟାଗତ ହନ ଏବଂ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଅବଶ୍ୟା ଦେଖିଲେନ ଯେ, ସେଇ ମୃତ-ଶିଳ୍ପୀର ପ୍ରେତାଜ୍ଞା ତାହାର ପ୍ରାଣ-ସଂହାରେର ଜୟ ଆସିଲେଛେ । ହତଭାଗ୍ୟ ମାଲେରାଓ ସେଇ ଶୟାତେଇ ଦେହତ୍ୟାଗ କରେନ ।

ପୁତ୍ରେର ଘୃତ୍ୟର ପର ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗୀ ସ୍ଥିର କରିଲେନ ଯେ, ବିଶ୍ୱସ ଆତ୍ମୀୟ ତୁକୋଜୀ ହୋଲକରେର ହାତେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରିଯା ସମ୍ମାନଗ୍ରହଣ କରିବେନ । କିନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟ ଇନ୍ଦୋରେ ଶୁଣ୍ଡ ସିଂହାସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟନ୍ତ୍ର ମାଥା ତୁଲିଯା ଉଠିଲେଛିଲ । ବୀର ମଲ୍‌ହରରାଓ-ଏର ପୁତ୍ରବଧୂ ଏବଂ ବୀରେର ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗୀ ଦେଖିଲେନ ଯେ, ଯେ-ରାଜ୍ୟ ତାହାର ଶୁଣ୍ଡର ଦୀର୍ଘଜୀବନ ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ ଯାପନ କରିଯା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଛେ, ଯାହାର ଜୟ ସ୍ଵାମୀ ଯୌବନେ ଜୀବନ ଦିଯାଇଛେ, ତାହା କତକ ଗୁଲି ହୀନ ସତ୍ୟନ୍ତ୍ର-କାରୀଦେର ହାତେ ଚଲିଯା ଯାଇବେ । ପ୍ରଭୁ-ଶକ୍ତିତେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହଇଯା ଅତଲ୍ୟାବାଙ୍ଗୀ ସ୍ଥିର କରିଲେନ ଯେ, ସମ୍ମାନ ସ୍ଥଗିତ ରାଖିଯା ଏହି ପୁତ୍ର-ବଂଶେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଗ୍ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଲେ ହଇବେ । ଏହି ସମୟ ହଇତେଇ ଅତଲ୍ୟାବାଙ୍ଗୀ-ଏର ସନ୍ତ୍ରାଜୀ-ମୂର୍ତ୍ତି ବିକଶିତ ହଇଯା ଉଠେ ।

ମଲ୍‌ହରରାଓ ହୋଲକରେର ପ୍ରଧାନ ଅମାତ୍ୟ ଗଞ୍ଜାଧର ସଶୋବନ୍ତ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଯାଇଲେନ ଯେ, ଅତଲ୍ୟାବାଙ୍ଗୀ ନାରୀ ଏବଂ ଏକପ୍ରକାର ଅସହାୟ । ତାହାକେ କିଛୁ ମାସୋହାରା ଦିଯା କାଶିତେ ସୁଥେ-ସୁଚନ୍ଦେ ରାଖିଯା ଦିଲେଇ ତିନି ସୁଥୀ ହଇବେନ । ଏହି କଲ୍ପନା କରିଯା ଗଞ୍ଜାଧର “ମାତୁନ୍ତ୍ରୀ, ଏହି ଶୋକ-ତାପମୟ ପୃଥିବୀର ସମ୍ପର୍କ ତ୍ୟାଗ କରିଯା ଆପନାର ଏଥନ କାଶିଧାମେ ବାସ କରା ଶ୍ରେଯଃ ।” ଅତଲ୍ୟାବାଙ୍ଗୀ ଆଗେ ହଇତେଇ

প্রস্তুত ছিলেন। গঙ্গাধর যশোবন্ত বুঝিতে পারেন নাই যে, তাহার কথা কহিবার পূর্বেই এই নারী তাহার অন্তরের বাসনা জানিতে পারিয়াছেন। উন্নরে রাণী অহল্যাবাঙ্গি বলিলেন, “আমার কাশী-বাসের সময় এখনও উন্নীর্ণ হয় নাই—এ-কথা সবার অপেক্ষা আমি ভাল জানি। আমার কর্তব্য লইয়া অপর কোনও লোকের মাথা দামাইবার কোনও প্রয়োজন নাই।” গঙ্গাধর যশোবন্ত দেখিলেন, চাতুরীতে হইবে না। তিনি গোপনে তদানীন্তন পেশোয়ার-পিতৃব্য রাঘোবাদাদা পেশোয়ার সহিত ইন্দোর-রাজ্য আক্রমণের বড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই রাঘোবাদাদা মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের এক কলঙ্ক। তিনিই প্রথম জ্ঞাতিশক্তিপে ইংরেজের সাহায্য লইয়া মহারাষ্ট্র-শক্তির মূলে কৃঠারাধাত করেন। গঙ্গাধরের পরামর্শে রাঘোবা সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া ইন্দোর-রাজ্য আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলেন।

অহল্যাবাঙ্গি সমস্তই অবগত হইলেন। মারাঠা-নারীর অন্তরে ক্ষাত্রশক্তি দাবানলের মতন জলিয়া উঠিল। কোথা গেল সে রিক্তা-তাপসীর সকরণ কোমল মৃত্তি... তাহার স্থলে বিকশিত হইয়া উঠিল সংহারকপিনী আঘাশক্তির মহিমা। প্রজাদের আহ্বান করিয়া বীর-নারী কহিলেন, “এক কৃতপূর্ব ব্রাহ্মণ আর একজন পেশোয়া-বংশের কলঙ্ক আজ ইন্দোরের পবিত্র সিংহাসন প্রাপ্ত করিতে আসিতেছে। তাহারা ভাবিয়াছে, আমি নারী। কিন্তু আমি শিলোদার (যুদ্ধোপ-জীবী অশ্বসৈনিকের জাতি) বংশের কন্যা। আমার শশুর আজীবন অসিহন্তে সংগ্রাম করিয়া এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আমি স্বয়ং অসিহন্তে সমরে বাইব। ইন্দোর-রাজ্যে যে মানুষ থাকিবে, আমার পশ্চাতে আসিবে।”

অহল্যাবাঙ্গি-এর এই তেজোদীপ্ত প্রকাশ দেখিয়া ইন্দোর-রাজ্যের সমস্ত প্রজা সমরের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ওধারে অহল্যাবাঙ্গি

গোপনে ছই বিশ্বস্ত কর্মচারীকে দিয়া তদানীন্তন পেশোয়া, ভোন্স্লে, গায়কওয়াড়, সেনাপতি দাভাড়ে এবং অগ্নাঞ্জ বিশিষ্ট বিশিষ্ট মারাঠা-মণ্ডলেষ্টারের নিকট রাঘোবাদাদা ও গঙ্গাধর যশোবন্তের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া সাহায্যের জন্য স্বত্ত্বে পত্র লিখেন।

মারাঠা-রঘুনাথ অন্তরের তেজস্ফুলিঙ্গ মারাঠার বীরদেরও অন্তর স্পর্শ করিল। সকলেই এই বীর-বাণীতে মোহিত হইয়া সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। স্বয়ং মাধব রাও পেশোয়াও সৈন্য পাঠাইলেন।

অহল্যাবাঙ্গ স্বয়ং যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ নিপুণ সেনাপতির মতন “গাড়ুরা ষেড়ী” নামক স্থানে বিভিন্ন সৈন্য-সমাবেশের আয়োজন করিলেন এবং কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া শক্র-আগমনের সমস্ত পথে আগে হইতেই তাহার সৈন্য-স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। সিপ্রা-নদীর তীরে যেখান দিয়া রাঘোবাকে সৈন্য লইয়া পার হইয়া আসিতে হইবে, সেখানে তুকোজী হোলকরকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন।

গঙ্গাধর যশোবন্ত স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, একজন সহায়-সম্বলহীন। বিধবা-রঘুনাথ এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ অন্তুত সামরিক আয়োজন করিতে সমর্থ হইবে।

প্রভুশক্তিতে উদ্বৃক্ত রাণী অহল্যাবাঙ্গ সেদিন মুণ্ডিতমস্তকে শিরস্ত্রাণ পরিলেন; বিধবার শুক্ল-বসন ত্যাগ করিয়া সৈনিকের বাস পরিধান করিলেন, যে-নেত্র করণায় তীর্থময় ভারতকে স্নেহরসে অভিসিঞ্চিত করিয়াছিল, সে-নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; তরবারিহস্তে হস্তীতে আরোহণ করিয়া মারাঠার কুলবধু সমগ্র সৈন্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই বরাভয়মৃত্তি দেখিয়া সৈন্যেরা আনন্দ-কোলাহলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

ওধারে সিপ্রা-নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া তুকোজী রাঘোবাকে

দৃতমুখে বার্তা পাঠাইলেন যে, যদি তিনি সৈন্য লইয়া সিংহা-নদী অতিক্রম করেন, তাহা হইলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য। চতুর রাঘোবা বুঝিল, গায়কওয়াড়, ভোন্স্লে, পেশোয়া ও ইন্দোরের সম্মিলিত সৈন্যের বিরুদ্ধে এ-যুক্তে তাহার পরাজয় অবশ্যভাবী, বিশেষ করিয়া অহল্যাবাঙ্গ চারিদিকে ঘেরুপ প্রচারকার্য করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই তাহার সাহায্য করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে রাঘোবা যুদ্ধের সকল আশা ত্যাগ করিয়া চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং দৃতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি যুদ্ধ করিতে আসেন নাই। মালেরাও-এর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি রাণী অহল্যাবাঙ্গকে সাম্মত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন মাত্র। তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি একা ইন্দোরে গিয়া অহল্যাবাঙ্গ-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

রাঘোবা একা সিংহা-নদী পার হইয়া তুকোজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অহল্যাবাঙ্গকে দর্শন করিবার অভিলাষ জানাইলেন। এই ভাবে বিনা রক্তপাতে যে সমস্ত মিটিয়া গেল, তাহাতে তুকোজী সানন্দে রাঘোবাকে ইন্দোরে লইয়া আসিলেন। অকারণ রক্তক্ষয় যে নিবারিত হইল তাহাতে অহল্যাবাঙ্গও সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাসমাদরে পেশোয়ার-পিতৃব্যকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

রাঘোবা একমাসকাল ইন্দোরে রহিলেন। তাহার অন্তরের বাসনা ছিল যে, অহল্যাবাঙ্গকে বুঝাইয়া যদি কোনওরকমে দক্ষক-পুত্র গ্রহণ করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে অহল্যাবাঙ্গ-এর মৃত্যুর পর তিনি অনায়াসে ইন্দোর-রাজ্য অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন।

ইন্দোরে থাকার সময় একমাস কাল কৃটবুদ্ধি রাঘোবার সহিত অহল্যাবাঙ্গ-এর সেব্য ও সেবকের কর্তব্য ও সম্বন্ধ বিষয় আলোচনা হয়। যাহাতে ইন্দোর-রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কার্যে পেশোয়ারগণের সাহায্য গ্রহীত হয়, তাহার জন্য রাঘোবা এই তর্কের সূচনা করেন।

কিন্তু “পুণ্য-জ্যোতি-বিমগ্নিতা” অহল্যাবাঙ্গ রাঘোবার ছরভিসক্রি বাধিতে পারিয়া, সমস্ত তর্কে তাহাকে পরাজিত করেন। যাহাকে জয় করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার নিকট সর্বরকমে পরাজিত হইয়া রাঘোবা ইন্দোর-রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

রাজনীতি-বিশারদ অহল্যাবাঙ্গ কিন্তু বুঝিয়াছিলেন যে, ইন্দোর রাজ্যের প্রতিপত্তি অঙ্গুষ্ঠ রাখিতে হইলে, তাহাকে সাক্ষাৎ ভাবে পেশোয়ার সহিত সংযুক্ত থাকিতে হইবে। সেইজন্য তিনি তদানীন্তন পেশোয়া মাধব রাওএর সহিত পত্র বিনিময় করিয়া ব্যবস্থা করেন যে, পেশোয়া রাজ-দরবারে ইন্দোরের দৃত হিসাবে অহল্যাবাঙ্গ-এর ছইজন লোক থাকিবে। সেই ছইজন দৃতের মধ্য দিয়া ইন্দোর ও পেশোয়া-রাজ্যের যোগাযোগ আটুট থাকিবে। মাধবরাও তাহাতে স্বীকৃত হন এবং রাণী অহল্যাবাঙ্গ বিশ্বস্ত সেনাপতি তুকোজী হোলকরকে তাহার প্রতিনিধিরূপে পেশোয়া-দরবারে পাঠাইলেন। তুকোজীকে পেশোয়া-দরবারে পাঠানোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে তাহার অবর্তমানে মারাঠা মোগলেশ্বরগণ তুকোজীকেই তাহার প্রতিনিধি হিসাবে সম্মান করিতে পারেন। কারণ, তাহার ইচ্ছা ছিল যে, পরে তুকোজীর উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তিনি দানে-ধ্যানে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন।

শাসকরূপে রাণী অহল্যাবাঙ্গ প্রজাদের জননী ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কখনও তাহার কোমলতার অন্যায় স্ববিধালইতে চাহিলে তিনি কঠোর হইয়া উঠিতেন। অহল্যাবাঙ্গ সিংহাসনে বসিয়া এক মুহূর্তের জন্য ভুলিতেন না যে, তিনি সম্রাজ্ঞী, প্রভুশক্তির আধার। স্থান বিশেষে কঠোরতা যে রাজধর্ম্ম তাহা তিনি ভালরকমই জানিতেন এবং যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, মুক্তিমতী করণ হইয়াও রাণী অহল্যাবাঙ্গ সিংহাসনের মর্যাদা-রক্ষায় পুরুষ-কঠোর হইয়াছেন।

ମେହି ସମୟକାର ଭୀଲ, ପିଣ୍ଡାରୀ ଅଭ୍ୟତି ଦସ୍ତ୍ୟଦେର ତିନି ସଥଳ କରନ୍ତାଯ ଓ ମେହେ ବଶ କରିତେ ପାରିଲେନ ନା, ତଥନ ରାଜକର୍ମୀ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଦେର ଗ୍ରାମ ଖଂସ କରିଯା, କାହାରେ ବା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଯା, ତିନି କାଲବିଲସ ନା କରିଯା ମେହି ଦସ୍ତ୍ୟଦେର ଉତ୍ପାତ ରହିତ କରେନ ।

ପ୍ରତିଦିନ ତିନି ରାଜବେଶେ ରାଜ-ସିଂହାସମେ ବସିଯା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଚାର ସ୍ୟଂ ତତ୍ତ୍ଵବଧାନ କରିତେନ । କୋନ୍ତେ ରାଜକର୍ମଚାରୀର କ୍ରିଟି ଦେଖିଲେ, ତିନି ତାହାର କଠୋର ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ କରିତେନ । କିଛୁମାତ୍ର ଶୈଥିଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିତେନ ନା ।

ଇନ୍ଦୋର-ରାଜ୍ୟ କୋନ୍ତେ ନିଃସମ୍ଭାନ ପ୍ରଜା ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବେ ସ୍ଵୀଯ ଧର୍ମ-ପତ୍ନୀକେ ଦତ୍ତକପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣେ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ ନା କରିଯା ଗେଲେ, ଦତ୍ତକପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣେ ଜନ୍ମ ଏ ମୃତପ୍ରଜାର ପତ୍ନୀକେ ରାଜାର ନିକଟ ଅନୁଭବି ଲାଇତେ ହେତ । ଦତ୍ତକପୁତ୍ର ନା ଲାଇୟା ଏ ପତ୍ନୀ ମରିଯା ଗେଲେ, ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ୍ରୀଳ ରାଜକୋଷେ ଚଲିଯା ଆସିତ । ରାଣୀ ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗ ଠିକ କରିଲେନ ଯେ, ଉଚ୍ଚ ଅର୍ଥେର ଉପର ରାଜକୋଷେର କୋନ୍ତେ ଦାବୀ ଥାକିବେ ନା । ଉହା ପରଲୋକଗତ ଆୟାର କଲ୍ୟାଣେର ଜନ୍ମ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟେ କଲ୍ୟାଣକର ଅନୁଷ୍ଠାନେ ବ୍ୟାପିତ ହେବେ । ପାଛେ କୋନ୍ତେ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ବ୍ୟାପାରେର ଅନ୍ୟାଯ ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରେ, ମେହିଜନ୍ମ ତିନି ସ୍ୟଂ ଏହି ବିଭାଗ ତତ୍ତ୍ଵବଧାନ କରିତେନ ଏବଂ ବହୁ ରାଜ-କର୍ମଚାରୀକେ ଉତ୍ପାଦିତ କରା ବା ଉତ୍କୋଚନ ଗ୍ରହଣ କରାର ଅପରାଧେ ପଦ୍ଧ୍ୟତ କରେନ । ମେଖାନେ କୋନ୍ତେ କ୍ଷମା ଛିଲ ନା । ମେହି ସମୟ ଭାରତେର ଅନେକ ରାଜାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାରା ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟେ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଲିକା ନିର୍ମାଣ ବା ପ୍ରହରେ ପ୍ରହରେ ନହବଂ ବାଜାନୋ, ଶିବିକାରୋହଣ କିମ୍ବା ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅଥବା ଦୁର୍ଗ-ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଛାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିତେ ପାରିତ ନା ; ତାହାତେ ନାକି ରାଜାର ପ୍ରତି ଅସମ୍ଭାନ ଦେଖାନୋ ହେତ । ମହାରାଣୀ ଅହଲ୍ୟାବାଙ୍ଗ ଏହି ଏହି ହାସ୍ତକର ଗୌରବ ଆଦ୍ୟରେ ଅଥବା ତୁଳିଯା ଦେନ ।

রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার সাহস ও প্রতিভার অনেক আধ্যায়িকা বিদ্ধমান আছে। এই সমস্ত আধ্যায়িকা-পাঠে জানা যায় যে, যখন মল্হর রাণও প্রলোকগমন করেন, তখন তিনি ধনাগারে প্রায় ঘোল কোটি টাকা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া থান। রাঘোবাদাদা এই সংবাদ অবগত হইয়া তাহার কিছু অংশ আভ্যন্তর করিবার জন্য অহল্যাবাস্টকে লিখিয়া পাঠান যে, “সৈন্য-ব্যয়ের জন্য বর্তমানে অর্থসঞ্চাটে পড়িয়াছি। মল্হর রাণও পেশোয়ারদের কার্যেই প্রভৃতি ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এখন পেশোয়ারদের বিপদে সেই অর্থ র্যবহৃত হওয়া উচিত।” রাঘোবার অভিথায় বুঝিতে পারিয়া অহল্যাবাস্ট বলিয়া পাঠাইলেন, “ধনাগারের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ আমি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক দানধর্মের জন্য রাখিয়াছি। যুদ্ধে প্রাণ যায় সে-ও স্বীকার, তবুও দানধর্মের জন্য সংকল্পিত অর্থ অন্তর্কার্য্যে ব্যয় হইতে দিব না।” এই প্রত্যাখ্যানে অপমানিত বোধ করিয়া রাঘোবা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ইন্দো-রাজ্য আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলেন।

রাণী অহল্যাবাস্ট কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আপনার পাঁচশত দাসীকে সৈনিকের বেশে সজ্জিত করাইয়া নিজে অশ্বরোহণে সৈনিক-বেশে রাঘোবার সম্মুখীন হইলেন। অহল্যাবাস্ট জানিতেন যে, মহারাষ্ট্ৰীয় সৈনিক কখনও রমণীর সহিত যুদ্ধ করিবে না। রাঘোবা এই ব্যাপার অবগত হইয়া যুদ্ধের আদেশ দিলেন, কিন্তু সর্দারগণ সকলেই অস্বীকৃত হইলেন। রাঘোবা নিরপায় হইয়া অহল্যাবাস্টকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, “আপনার সৈন্য-সামন্ত কোথায়?” অহল্যাবাস্ট চতুরতার সহিত উত্তর দিলেন, “আমরা শ্রীমন্ত পেশোয়া-গণের সেবক, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া রাজদোষী হইতে চাহি না। তবে হোলকর-বংশের ধৰ্মার্থ-উৎসৃষ্টি সম্পত্তি রক্ষা করাও আমার ধৰ্ম। সেইজন্য আপনার যদি ইচ্ছা হয়, আমাদের বধ

করিয়া ধৰ্মার্থ-রক্ষিত সম্পত্তি আপনি অধিকার করুন।” অহল্যার এই কৌশলপূর্ণ উত্তরে পরাজিত হইয়া রাঘোবা সে-সম্পত্তির আশা ত্যাগ করিলেন।

রাণী অহল্যাবাঙ্গ সকল দিক দিয়া আঁচ্ছা ছিলেন। কোনও চাটুবাক্য, কোনও মিথ্যামোহ তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিত না। যেখানে তাহার কোনও সন্তাননা দেখিতেন, সেখানে তিনি নির্মম হইয়া উঠিতেন। একবার এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অহল্যার অনুগ্রহ পাইবার আশায় তাঁহার গৌরবপূর্ণ এক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। পুরক্ষারের আশায় ব্রাহ্মণ অতিমাত্রায় এবং নানা স্থলে মিথ্যাভাবে অহল্যার প্রশংসনা করেন। অহল্যাবাঙ্গ গঙ্গীর-ভাবে সমগ্র গ্রন্থখানি শুনিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাণী যখন সমগ্র গ্রন্থ শুনিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই পুরক্ষার দিবেন। গ্রন্থ-পাঠ শেষ হইলে অহল্যাবাঙ্গ গ্রন্থখানি স্বহস্তে লইয়া একজন কর্মচারীকে উক্ত গ্রন্থখানি অবিলম্বে নর্মদার জলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং তোষামোদকারী ব্রাহ্মণের কোনও খবর লইলেন না।

কিন্তু আজ যে মুহূর্তে অহল্যাবাঙ্গ ভারতের আবালবৃন্দবনিতার হস্তয়ের সিংহাসনে অসীন হইয়া আছেন, তাহা তাঁহার করুণাময়ী মূর্তি ! নয়নে করুণা, একহস্তে দয়া, অপর হস্তে সেবা। সেদিনকার যে সমস্ত কৃধিত মানব, নিরন্ম ভিখারী, দরিদ্র ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎভাবে এই মূর্তিমতী করুণার স্নেহস্পর্শ পাইয়া ধন্ত হইয়াছিল, তাহারা আজ নাই, কিন্তু করুণাময়ীর অমর স্মৃতিস্মরণ আজও উত্তর ও মধ্য-ভারতের তীর্থসমূহ করুণার প্রস্তর-প্রতীকের মত বিরাজ করিতেছে। কীট, পতঙ্গ, মৎস্য যে কোনও জীব রাণী অহল্যাবাঙ্গ-এর করুণা হইতে বঞ্চিত হইত না। পাথীরা ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিয়া

পঞ্চকন্ত্র

কৃষকদের ক্ষতি করিত বলিয়া কৃষকরা পাখীদের নির্যাতন করিত। তিনি আকাশগামী পক্ষীদের আহারের জন্য স্থানে স্থানে ক্ষেত্রে করাইয়া দিয়াছিলেন। যখনই তিনি কোনও তৌরে যাইতেন, ভূরি-ভূরি খাড় জলস্রোতে দিতেন, জলচররা খাড় পাক। কাশীর অহল্যা-বাটী ব্ৰহ্মপুরী, অহল্যা-বাটী ঘাট, বিশ্বেশ্বরের মন্দির, মণিকৰ্ণিকা ঘাট, গয়ার বিষ্ণুপাদপদ্ম মন্দির আজিও সেই করণাময়ীর পুণ্য-কীর্তির কথা কীর্তন করিতেছে।

জীবনের অবশিষ্টাংশ রাণী অহল্যা-বাটী গঙ্গার তৌরে মহেশ্বরক্ষেত্রে শাস্ত্রোক্ত পূজার্চনায় অতিবাহিত করেন। রাজ্যের সমস্ত ভার তিনি স্বেচ্ছায় বিশ্বস্ত সেনাপতি তুকোজী হোলকরকে সমর্পণ করেন। তুকোজী হোলকরের বংশধরগণই আজ ইন্দোরের হোলকর বলিয়া পরিচিত।

১৮৯৫ খন্তাবে শ্রাবণ মাসে নর্মদার তৌরে পুণ্যধাম মহেশ্বর-ক্ষেত্রে করণাময়ী অহল্যা-বাটী নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন।

মারাঠা কবি দেবী অহল্যা-বাটীকে আত্মাশক্তির অংশভূতা জ্ঞানে গাহিয়াছেন—

“হে দেবী ! তুমি নর্মদা-তীর ত্যাগ করিতেছ না, কাৰণ নর্মদা তোমার প্ৰিয়স্থী। নর্মদা গঙ্গারও স্থী—সেই স্থীত সূত্রেই কি তুমি এৱপ পৃতহন্দয় হইয়াছ ?”

—রাণী ভবানী

অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর পুণ্যনাম বাংলার শোকাঙ্ককারময় যুগকে পরিপূর্ণ জ্যোতিতে আজও আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই বিপ্লব, হৃতিক্ষ ও বড়যন্ত্রের যুগে রাণী ভবানী বাঙালী বিধবা-রমণী হইয়া প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দীকাল ধরিয়া সগৌরবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে এই বাংলার প্রায় অর্দ্ধেক ভূমি শাসন করিয়া গিয়াছেন। রাণী ভবানীর বার্ষিক আয় সেই সময় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছিল এবং তিনি স্বয়ং নবাব-রাজ্যের সরকারে সম্মত লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতেন।

রাণী ভবানীর জীবন বুঝিতে হইলে সেই সময়কার বাংলার শাসন-ব্যাপার এবং নাটোরের রাজ-পরিবারের ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। এইখানে সংক্ষেপে তাহারই বর্ণনা করিব।

ওরঙ্গজেব তখন দিল্লীর অথবা ভারতের সদ্বাট। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত মোগল-সাম্রাজ্যের মধ্যে তখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। কেবলমাত্র দিল্লীর রাজ-সরকারে বার্ষিক কর দিয়াই সমস্ত অধীন রাজাদের কর্তব্য চুকিয়া যাইত; ইহা ব্যতীত তাহারা স্ব স্ব দেশে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই একরকম রাজত্ব করিতেন। যখনই রাজস্ব আদায়ে গোলমাল হইত, তখনই দিল্লীর সরকারের উন্ক নড়িত। কোনো কোনো স্থানে দিল্লী হইতে রাজ-প্রতিনিধিকর্পে রাজার সমস্ত শক্তি দিয়া লোক পাঠানো হইত, তাহারাই স্থানীয় শাসনকর্তা হইতেন এবং প্রতি বৎসর দিল্লীতে রাজস্ব পাঠানোই প্রকৃতপক্ষে

তাঁহাদের সর্বপ্রধান কাজ ছিল। এই সমস্ত শাসনকর্তা স্ব স্ব প্রদেশের জমিদারগণের নিকট রাজস্ব আদায় করিতেন এবং যথাসময়ে রাজস্ব দিলেই এই সমস্ত জমিদারগণও একরকম স্বাধীনভাবেই স্ব স্ব এলাকার মধ্যে রাজস্ব করিতে পারিতেন।

১৭০১ খ্রিষ্টাব্দে ওরঙ্গজেব স্বীয় পৌত্র আজিমকে রাজ-প্রতিনিধি অর্থাৎ নবাব আজিম করিয়া এবং স্বীয় বিশ্বস্ত কর্মচারী মুশিদকুলি খাঁকে নবাব-দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া বাংলাদেশে পাঠান। তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী ছিল ঢাকা শহর। বাংলাদেশ হইতে রাজস্ব আদায়ে তখন গোলমাল হইতেছিল বলিয়া সআট ওরঙ্গজেব এই ব্যবস্থা করেন। মুশিদকুলি খাঁ সআটকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বাংলাদেশে আসিয়াই প্রথম বৎসরে এক কোটি টাকার রাজস্ব দিল্লীতে পাঠাইলেন। এই টাকা পাইয়া সআট ওরঙ্গজেব মুশিদকুলি খাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

রাজস্ব আদায়ের হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দিবার সময় ঢাকা শহরে প্রত্যেক জমিদার এক-একজন করিয়া মোক্তার নিযুক্ত রাখিতেন। এই সমস্ত মোক্তারের উপর জমিদারগণের মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি অনেকাংশে নির্ভর করিত। এই সমস্ত মোক্তারের সহিত আবার সাক্ষাৎভাবে দিল্লীর সআটের নিযুক্ত “কার্লুনগো”দের কাজ-কারবার সাক্ষাৎভাবে দিল্লীর সআটের নিযুক্ত “কার্লুনগো”দের কাজ-কারবার সাক্ষাৎভাবে দিল্লীর সআটের নিযুক্ত “কার্লুনগো”দের কাজ-কারবার সাক্ষাৎভাবে দিল্লীর সআটের নিযুক্ত থাকিত। দিল্লীতে বার্ষিক রাজস্ব পাঠাইবার সময় হিসাব-পত্রে এই দুইজন কার্লুনগোর নিজ নামাঙ্কিত মোহর না থাকিলে তাহা দিল্লী সআটের নিকট গ্রাহ হইত না। স্বতরাং নিম্ন পদবীর হইলেও এই দুইজন কার্লুনগোকে সন্তুষ্ট রাখিয়াই নবাব-দেওয়ানকে চলিতে হইত।

এই সময় পুঁটিয়ার মহারাজার পক্ষ হইতে মোক্তার হইয়া রঘুনন্দন বলিয়া এক ব্যক্তি ঢাকায় আসেন। এই রঘুনন্দনই প্রকৃতপক্ষে নাটোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

রঘুনন্দন স্বীয় প্রতিভাবলে সামান্য অবস্থা হইতে এক বিরাট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পিতার নাম কামদেব মৈত্রেয়। কামদেব রাজশাহীর অন্তর্গত পুঁটিয়ার তৎকালীন মহারাজ নরনারায়ণ ঠাকুরের অধীনে অতি সামান্য বেতনে বারহাইচী গ্রামের তহশীল আদায় করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামজীবন, মধ্যম রঘুনন্দন, কনিষ্ঠ বিষ্ণুরাম। সেই সময় রাজ-সরকারে উচ্চপদ পাইতে হইলে ফার্সী ভাষা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। রাম-জীবন ও রঘুনন্দন উভয়েই অতি অল্পকালের মধ্যে সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন এবং প্রতিভাবলে দুই ভাতাই পুঁটিয়ার রাজ-সরকারে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। দুই ভাতার মধ্যে হিসাব-নিকাশ কার্য্যে রঘুনন্দনের প্রতিভা সমধিক থাকায় মহারাজ নরনারায়ণ ঠাকুর রঘুনন্দনকে মোক্তার করিয়া ঢাকায় প্রেরণ করেন। ঢাকা-দরবারে ফার্সীতেই হিসাব-নিকাশের এক সহজ পন্থা আবিষ্কার করার জন্য তিনি অচিরেই নবাব-দেওয়ানে একজন বিখ্যাত কর্মচারী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রতিভায় মুশিদকুলি খাঁ বিমুক্ত হইলেন। নবাব আজিম ওসমান ও মুশিদকুলি খাঁর চেষ্টায় রঘুনন্দন নবাব-সরকারের নায়েব কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময় মুশিদকুলি খাঁ ও নবাব আজিম ওসমানের সহিত সংঘর্ষ বাধিতে থাকে। ক্রমশঃ এই ব্যাপার প্রকাশ্য ঘূর্নের রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল। নবাব আজিম ওসমান মুশিদকুলি খাঁকে হত্যা করিবার ঘড়্যন্ত করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ দিল্লীর সন্তাটের নিকট পৌঁছিলে কালবিলম্ব না করিয়াই তিনি স্বীয় পৌত্রকে পার্টনার

নবাব করিয়া স্থানান্তরিত করিলেন এবং মুশিদকুলি থাকে হিসাব-নিকাশ সাক্ষাৎভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য দিল্লীতে আহ্বান করিলেন।

নবাব আজিম ওসমান দেখিলেন যে, মুশিদকুলি থাঁ যদি সত্রাটের সম্মুখে হিসাব-পত্র উপস্থিত করিতে পারে, তাহা হইলে সত্রাট সন্তুষ্ট হইয়া মুশিদকুলি থাঁর কথাই বিশ্বাস করিবেন এবং মুশিদকুলি থাঁ তাহার সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা নিশ্চয়ই সত্রাটকে বলিয়া দিবে। স্বতরাং সত্রাটের নিকট যাহাতে মুশিদকুলি থাঁ অপদস্থ হন, নবাব আজিম ওসমান তাহার পক্ষ ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, নায়েব কাছুনগো যদি হিসাব-নিকাশ পত্রে স্বীয় নাম-মোহর না দেন, তাহা হইলে মুশিদকুলি থাঁ দিল্লীর দরবারে হিসাব-পত্র উপস্থিত করিতে পারিবে না। এই স্থির করিয়া নবাব আজিম ওসমান ভবিষ্যতের লোভ দেখাইয়া রঘুনন্দনকে এই কার্যে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। মুশিদকুলি থাঁ এই ব্যাপার জানিতে পারিলেন এবং তিনিও রঘুনন্দনকে অনুরোধ করিলেন যে, নবাব আজিম ওসমানের কথা যেন তিনি না শুনেন। রঘুনন্দন উভয় সংকটে পড়িলেন। হিসাব-পত্রে দুইজন কাছুনগোর স্বাক্ষরই চাই, কিন্তু অপর একজন নবাব আজিম ওসমানের প্ররোচনায় পূর্ব হইতেই মুশিদকুলি থাঁর বিরুদ্ধে দাঢ়াইয়াছিল। মুশিদকুলি থাঁর সমস্ত মান-মর্যাদা সেদিন রঘুনন্দনের উপর নির্ভর করিয়াছিল এবং রঘুনন্দন সেদিন অনেক বিবেচনা করিয়া সত্রাটের পৌত্রের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া মুশিদকুলি থাঁর হিসাবপত্রে নিজ নামের মোহরাক্ষিত করিলেন। এই কার্যের জন্য মুশিদকুলি থাঁ আজীবন রঘুনন্দনের উপর কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ অচিরেই রঘুনন্দন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার হইতে পারিয়াছিলেন।

পঞ্চকন্যা

একমাত্র রঘুনন্দনের স্বাক্ষর লইয়াই মুশিদকুলি খাঁ দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইলেন। বিপুল উপচোকন এবং অর্থে গ্রীত হইয়া সদ্বাট দুইজন কাছুনগোর স্বাক্ষরের কথাই তুলিলেন না। তাহা ছাড়া রঘুনন্দনের স্বুখ্যাতি দিল্লীর দরবারেও পৌছিয়াছিল। সমাট মুশিদকুলি খাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার একমাত্র নবাব করিয়া ঢাকায় প্রেরণ করিলেন।

নবাব হইয়া ঢাকায় আসিয়া মুশিদকুলি খাঁ রঘুনন্দনকে আপনার প্রধান মন্ত্রী করিলেন এবং তাঁহাকে ‘রায় রঁইয়ান’ উপাধি দিলেন। রঘুনন্দনের পরামর্শে বাংলা, বিহার ও উড়িয়া শাসিত হইতে লাগিল। পূর্বেই বলিয়াছি, সেই সময় জমিদারগণ স্ব স্ব এলাকার মধ্যে এক রকম স্বাধীনভাবেই জমিদারী ঢালাইতেন অথবা রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রীতিমত সৈন্য ছিল। অনেক জমিদার নবাবকে অগ্রাহ্য করিত, যথা সময়ে কর দিত না, কেহ কেহ করই দিত না। মুশিদকুলি খাঁ নবাবী পাইয়া যাহাতে রাজস্ব নিয়মিত আদায় হয়, তাহার কঠোর ব্যবস্থা করিলেন এবং এই কার্যের জন্য তাঁহার ‘নাত জামাই’ মোহাম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। রেজা খাঁর কঠোর শাসনে ও পীড়নে বাংলার জমিদারকুলে এক আসের সংকার হইল। রাজস্ব না দিতে পারিলে, ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়, ইহা রাজ-নিয়ম। এই নিয়মের বলে বহু ভূম্যধিকারী ভূমিচৃত হইল। অনেকে নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার ফলে সংঘর্ষে বিলুপ্ত হইল, অনেকে বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এখন এই সমস্ত পরিত্যক্ত ভূমির একজন করিয়া নৃতন জমিদার সৃষ্টি করার প্রয়োজন হইল। মুশিদকুলি খাঁ এই সমস্ত পরিত্যক্ত জমিদারী রঘুনন্দনকে দিতে চাহিলেন। কিন্ত আতঙ্ক রঘুনন্দন সমস্ত সম্পত্তি জ্যোষ্ঠ ভাতা রামজীবনকে দেওয়াইলেন। রামজীবন

এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া নাটোরে ১৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। দিল্লীর সন্তাট তাহাকে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করিলেন এবং সৈন্য ইত্যাদি রাখিবার ব্যাপারেও বিশেষ সুবিধা দিলেন। ইহাই হইল নাটোর-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে রাজস্ব অনাদায়ের জন্য যত ভূ-সম্পত্তি স্বত্ত্বালীন হয়, তাহা সমস্তই মুর্শিদকুলি খাঁ রামজীবনকে দিয়াছিলেন। যশোহরের বিখ্যাত ভুঁইঝঁ সীতারাম রায়ের সম্পত্তি ও এই নাটোর-রাজের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাংলার ইতিহাসে ইহা অতীব গ্রানিত ও কলঙ্কের কথা যে, বাংলার শেষ স্বাধীন ব্যক্তির অন্তর হইতে স্বাধীনতা-স্পৃহাকে নির্মমভাবে বিনষ্ট করিবার জন্য বাঙালী রঘুনন্দন এবং তাহার স্বয়োগ্য কর্ণচারী দীঘাপতিয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়কেই অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। দয়ারাম রায়ের কৌশলেই সীতারাম রায় অবশেষে পরাস্ত হইয়া লৌহ-পিণ্ডরাবদ্ধ অবস্থায় মুর্শিদবাদে আনীত হন। কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

সীতারাম রায়ের সন্তর লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি নাটোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর দিল্লীর সন্তাট রাজা রামজীবনকে মহারাজ বাহাদুর উপাধি দেন। তখন নাটোর-রাজ্যের বার্ষিক আয় দেড় কোটি টাকা এবং এতবড় জমিদার বাংলাদেশে তখন আর কেহই ছিলেন না। দয়ারাম রায় এই বিরাট রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত হন। যদিও তিনি লেখাপড়া খুব বেশী জানিতেন না, তথাপি তাহার রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং ব্যক্তিগত সাহস অসীম ছিল। দেওয়ান রঘুনন্দন জ্যেষ্ঠ ভাতাকে দেবতার তুল্য শ্রদ্ধা করিতেন এবং যখনই নবাবের নিকট কোনও জমিদারী পাইতেন, তখনই তাহা জ্যেষ্ঠ ভাতাকে দিয়া দিতেন।

୧୭୨୪ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ ସହସା ମହାରାଜ ରାମଜୀବନେର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର କାଲିକାପ୍ରସାଦ ଘୃତ୍ୟମୁଖେ ପତିତ ହିଲେନ । ତାହାର କିଛୁକାଳ ଯାଇତେ ନା ଯାଇତେଇ ରୟୁନନ୍ଦନଓ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଲେନ । ସହସା ଏହି ଦୁଇ ଭୀଷଣ ଶୋକେ ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହଇଯା ପଡ଼ିଲେନ ଏବଂ ସମସ୍ତା ହଇଲୁ ଯେ, ତାହାର ଘୃତ୍ୟର ପର କେ ଏହି ବିରାଟ ସମ୍ପଦିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିଲେବେ । ଯଦିଓ ତାହାର କନିଷ୍ଠ ଭାତା ବିଶ୍ୱରାମେର ପୁତ୍ର ଦେବକୀପ୍ରସାଦ ବଞ୍ଚିଲାନ ଛିଲ, ତଥାପି ତିନି ଦକ୍ଷକପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଇ ଶ୍ରୀ କରିଲେନ ଏବଂ ରାଜସାହୀ ଜେଲାର ରସିକ ରାୟ ଥାଁ ଭାଦ୍ରୀର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମକାନ୍ତକେ ଦକ୍ଷକ-ପୁତ୍ରରାପେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେନ । ଇହାତେ ଦେବକୀପ୍ରସାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହିଲେନ ଏବଂ ମନେ ମନେ ନାନାରକଗ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଲେନ । ମହାରାଜ ରାମଜୀବନ ତାହାକେ ଛୟ-ଆନା ଅଂଶ ଦିତେ ଚାହିୟାଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଦେବକୀପ୍ରସାଦ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେନ ନାହିଁ । ମହାରାଜ ରାମଜୀବନେର ଦକ୍ଷକପୁତ୍ର ଏବଂ ନାଟୋର-ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାମକାନ୍ତଙ୍କୁ ରାଣୀ ଭବାନୀର ସ୍ଵାମୀ ।

୧୭୨୪ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦେ ରାଜସାହୀ ଜେଲାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାତିନ୍ ଗ୍ରାମେ ରାଣୀ ଭବାନୀ ଜଳଗ୍ରହଣ କରେନ । ତାହାର ପିତାର ନାମ ଆଦ୍ମାରାମ ଚୌଧୁରୀ । ତିନି ଏକଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୟମିଦାର ଛିଲେନ । ରାଣୀ ଭବାନୀର ସଥଳ ଆଟ ବଂସର ମାତ୍ର ବୟସ, ତଥଳ ନାଟୋରେ ଭବିଷ୍ୟତ ମହାରାଜ ରାମକାନ୍ତର ମହିତ ତାହାର ବିବାହ ହୁଏ । ମହା-ମହାରୋହେ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପଦ ହୁଏ ।

ରାଣୀ ଭବାନୀ ପିତୃଗୁହେ ସାମାନ୍ୟ ଲେଖାପଡ଼ା ଶିଖିଯାଛିଲେନ । ଧାରା-ପାତେର ଅଙ୍କ ଶିଖିବାର ସମୟ ତିନି ହୁଏବେ ଭାବେନ ନାହିଁ ଯେ, ଏକଦିନ ତାହାକେ କୋଟି କୋଟି ଟାକାର ହିସାବ ନିଜହାତେ ଦେଖିଲେ ହିଲେବେ । ସ୍ଵାମିଗୁହେ ଆସିଯା ରାଣୀ ଭବାନୀର ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷ ବନ୍ଦୋବନ୍ଦ କରା ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ-ମହିଳାର ସାହାଯ୍ୟ ତିନି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରତ, ବ୍ୟାକରଣ, ପୂର୍ବାନ୍ତ ଏବଂ ସଂକ୍ରତ-ରାଜନୀତିଗ୍ରହ ଅଧ୍ୟୟନ କରେନ ।

সেইসঙ্গে তিনি স্বামীর নিকট বাল্যকাল হইতেই জমিদারী বিষয়ে শিক্ষা লইতেন। অতি অল্পকালের মধ্যে জমিদারী বিষয়ে বালিকা-বধূ এতদূর পারদর্শী হইয়া উঠিলেন যে, প্রবীণ দেওয়ান দয়ারাম অনেক সময়ে অনেক জটিল বিষয়ে রাজবধূর সিদ্ধান্ত শুনিয়া বিশ্বিত হইয়া যাইতেন।

রামকান্তের বিবাহের বৎসরই মহারাজ রামজীবন পরলোকগমন করিলেন। যুবক মহারাজ রামকান্ত প্রভুতন বিচক্ষণ দেওয়ান দয়ারামের সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

এই সময় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে এক মহা-বিঘ্নের ও অশান্তির যুগ সূচনা হয়। নবাব মুশিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর সুজাউদ্দিন বাংলার নবাব হন, কিন্তু সুজাউদ্দিন বার্দিক্যজনিত অসুস্থ হইয়া পড়ার তাহার পুত্র সরফরাজ খাঁ পিতার নামে রাজত্ব পরিচালনা করিতেন। সরফরাজ খাঁ আপনার বিলাসিতা ও অমিত-ব্যয়িতার জন্য সকলের অপ্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই সময় বাংলায় নানা প্রকারের ব্যভিচার মাথা তুলিয়া দেখা দিতে লাগিল। সুজা খাঁর আমলে আলিবদ্দী খাঁ নামক সৈন্যবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। সুজা খাঁ আলিবদ্দী খাঁকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ইহাই হইল সফররাজ খাঁ ও আলিবদ্দী খাঁর মধ্যে মনান্তরের কারণ। সুজা খাঁ একটা আসন্ন গৃহ-বিল্লু আশঙ্কা করিয়া আলিবদ্দী খাঁকে পাটনার শাসনকর্তা করিয়া স্থানান্তরিত করিলেন। কিন্তু তাহাতে সরফরাজ খাঁর অশান্তি আরও বর্দিত হইল। সুজা খাঁর মৃত্যুর পর আলিবদ্দী খাঁ ও সরফরাজ খাঁ-তে প্রকাশ্য যুদ্ধ বাধিল। ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে আলিবদ্দী খাঁ গিরিয়ার রণক্ষেত্রে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

পঞ্চকন্যা

বাংলার ইতিহাসে আলিবদ্দী খাঁর মত প্রজাবৎসল নবাব বিরল
বলিলেই হয়। কিন্তু এই আলিবদ্দী খাঁর আমলে ভাগ্যক্রমে
কিছুকালের জন্য রাণী ভবানী সর্বপ্রথম বিপদের সম্মুখীন হন।
দেবকীপ্রসাদ আপনাকে নাটোর রাজ্যের আয় উত্তরাধিকারী
ভাবিতেন এবং তিনি সর্বদাই চেষ্টায় ছিলেন, কি উপায়ে মহারাজ
রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করা যায়। মহারাজ রামকান্তের নাটোর
রাজ্যের অধিকারী হওয়া যে শ্যায়সঙ্গত নয়, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য
তিনি সুজা খাঁর এবং সরফরাজ খাঁর দরবারে বহু চেষ্টা করেন।
কিন্তু তখন তাঁহার চেষ্টার কোনও ফল লাভ হয় নাই।

আলিবদ্দী খাঁ যখন নৃতন নবাব হইয়া আসিলেন, তখন দেবকী-
প্রসাদের চক্রান্ত সফল হইল। দেবকীপ্রসাদ আলিবদ্দী খাঁর সহিত
দেখা করিয়া জানাইলেন যে, তিনিই নাটোর-রাজ্যের আয় উত্তরাধিকারী ; কারণ, অপুত্র মহারাজ রামজীবনের তিনিই একমাত্র
আতুপুত্র। রামকান্তকে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ
করা হয় নাই। ইহা ব্যতীত তাঁহাকে পুনরায় নাটোরের গদিতে
বসানো হইলে তিনি বর্তমান রাজ্যের দ্বিতীয় রাজ্য দিতে পারিবেন।
রামকান্ত গরীবের ছেলে, এত বড় জমিদারী শাসনের একান্ত
অযোগ্য। আলিবদ্দী খাঁ তখন বাংলার আভ্যন্তরিক গৃহ রাজনীতি
অথবা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই চিনিতেন না এবং তাঁহার টাকারও বিশেষ
প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য তিনি দেবকীপ্রসাদকে সনদ দিয়া নাটোরে
পাঠাইলেন।

নবাবের সনদ পাইয়া বৌর-দর্পে দেবকীপ্রসাদ নাটোরে প্রবেশ
করিয়া রামকান্ত ও তাঁহার যুবতী স্ত্রী রাণী ভবাণীকে নাটোরের
রাজপ্রাসাদ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া
রামকান্ত স্ত্রীকে লইয়া মুশিদাবাদে ধনকুবের জগৎ শেষের বাড়ীতে

পঞ্চকল্যা

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বৃক্ষ দেওয়ান দয়ারাম রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দীর্ঘাপতিয়াতে এক প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া সেইখানে দিনপাত করিতেছিলেন। মহারাজ রামকান্তের ছুর্গতির কথা শুনিয়া তিনিও মূর্খিদাবাদে আসিলেন এবং স্থির হইল যে, তিনি ও জগৎ শেষ, মহারাজ রামকান্ত ও রাণী ভবানীকে লইয়া রাজ-দরবারে যাইবেন। রাজ-দরবারে উপচৌকন দিবার জন্য রাণী ভবানী তাঁহার সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কার জগৎ শেষের নিকট বাঁধা রাখিয়া টাকা গ্রহণ করিলেন। উপচৌকনসহ নবাবের সমীক্ষে উপস্থিত হইয়া দয়ারাম নৃতন নবাবকে রাজসাহী জমিদারীর প্রকৃত অবস্থা ও তাহার প্রকৃত স্বত্ত্বাধিকারী কে, তাহা প্রমাণ প্রয়োগের সহিত বুঝাইয়া দিলেন। নবাব আলিবদ্দী খাঁ নিজের ক্রটী বুঝিতে পারিয়া নাটোর-রাজ্যের খাতাপত্র সমস্ত পরীক্ষা করিয়া পুনরায় রামকান্তকেই নাটোরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নাটোরের প্রজারা ও বাঁচিল, কারণ, রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই দেবকীপ্রসাদ নানা-প্রকার অনাচারে ও অত্যাচারে সমস্ত রাজসাহী প্রদেশ ভরিয়া তুলিয়াছিল। রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর রাণী ভবানীর পরামর্শ অনুসারে সর্বপ্রথম দেবকীপ্রসাদের আমলে প্রজাদের যে-সমস্ত সর্বনাশ অন্তিম হইয়াছিল, তাহার প্রতিকারের চেষ্টা হইল। যে-সমস্ত প্রজার ঘর-বাড়ী আলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাজকোষের অর্থে তাহা পুন-নির্মিত হইল। খাজনা অনাদায়ের জন্য যাহাদের জমিদারী হইতে নির্বাসিত করা হইয়াছিল, তাহাদের পুনরায় আহুতান করিয়া আনা হইল। রাজ্যভিয়েকের দিন নাটোর-সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আত্মীয়-স্বজন ও বহু বরেণ্য ব্যক্তির আনন্দধনিতে আবার ভরিয়া উঠিল। প্রজারা বুঝিতে পারিল, রাজ-সিংহাসনের পাশে যিনি বসিয়া থাকেন, তিনি শুধু রাজ-মহিষী নন, তিনি লোক-মাতাও বটে।

সেই সময় বাংলায় বর্গীর উৎপাত আরম্ভ হয়। সমগ্র বাংলা এই বর্গীর আতঙ্কে শক্তিত হইয়া উঠে। চারিদিকে অশান্তি দাবাপ্পি-শিখার মত জলিয়া উঠিল। স্বয়ং নবাব আলিবদ্দী থাঁ এই বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণে অসমর্থ হইয়া ‘চৌথ’ অথবা বাংলা, বিহার ও উত্ত্যার রাজস্বের চারি অংশের এক অংশ দিয়া তাহাদের প্রতিবৎসর সন্তুষ্ট করিতেন।

বর্গীর হাঙ্গামার স্মৃতি লইয়া ক্ষুদ্র জমিদারগণও বিজ্ঞাহী হইয়া উঠিতে লাগিল। এই অরাজকতা ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের মধ্যে অকস্মাত মহারাজ রামকান্ত ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন। রাণী ভবানীর তখন মাত্র চরিশ বৎসর বয়স। সমস্ত বিপদ মাথায় করিয়া সেই ঘন-ছর্য্যাগের মধ্যে রাণী ভবানী শুন্দাচারিণী হিন্দু-বিধবা হইয়াও বিপ্লব-বিক্রুক্ত সেই অর্দ্ধবন্দের শাসনের ভার লইলেন এবং একপ দক্ষতার সহিত তিনি রাজ্য-পরিচালনা করেন যে, বর্গীর হাঙ্গামার সময় স্বয়ং নবাব আলিবদ্দী থাঁ স্বীয় পরিবারবর্গের নিরাপদের জন্য নাটোরের নিকট রামপুর বোয়ালিয়ার তাঁহাদের রাখেন। বর্গীর উৎপাত হইতে তাঁহার জমিদারী রক্ষা করিবার জন্য রাণী ভবানী পশ্চিম হইতে আনন্দ লোকদের লইয়া একটি সৈন্য-বাহিনী সংগঠন করেন।

সেই বিরাট জমিদারী রাণী ভবানীর নখদর্পণে ছিল। শাসন-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখিতে পারিতেন না এবং দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরকাল তিনি নিজে এমনভাবে সমস্ত জমিদারী পরিচালনা করেন যে, এতবড় বর্গী-হাঙ্গামার পর নবাব-সরকারে তাঁহার দেয়-খাজনা কখনও বাকি পড়ে নাই, অথচ প্রজারাও নিপীড়িত হয় নাই। একদিকে তিনি ছিলেন স্থির, ধীর, শাসনকর্তা; অপরদিকে তিনি ছিলেন একান্ত কোমলা, বাঙালীর গেয়ে, দালে যাহার আনন্দ, তপস্থায় যাহার শান্তি, স্নেহে যাহার পরিসমাপ্তি।

রাণী ভবানীর এক পুত্র ও এক কন্তা জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু হৃষ্টাগ্যবশতঃ শৈশবেই পুত্রটি মারা যায়। কন্তাটির নাম তারা দেবী। খাজুরা গ্রাম নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারা দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের পরের বৎসরই তারা দেবী বিধবা হন। রাণী ভবানী কন্তাকে জমিদারী বিষয়ে সমস্ত শিক্ষা নিজহস্তে দিয়াছিলেন, সেইজন্ত সেই বিরাট রাজত্ব পরিচালন-কার্য্যে তিনি বিধবা কন্তাকে তাহার প্রধান সহায়ক করিয়া লইয়াছিলেন।

বিধবা হইবার পর তিনি শাস্ত্রোচ্চ নিয়ম পালন করিয়া ব্রহ্ম-চারিণীর জীবন ধাপন করেন। কুড়িলক্ষ প্রজার শাসন-কার্য্যের অবসরে তিনি প্রতিদিন স্বীয়হস্তে হবিষ্যান পাক করিতেন এবং রাত্রি চারিদণ্ডের সময় শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নান ও পূজার পর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া রাজপুরীর সকল মহিলাকে শুনাইতেন। তাহার পর রাজকার্য্য মনোযোগ দিতেন। বিধবা হইবার পর তিনি ভূমি-শয্যাতেই শয়ন করিতেন।

আলিবদ্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাহার দৌহিত্র বিলাসী সিরাজদৌলা বাংলার নবাব হইলেন। আলিবদ্দী খাঁর আমলে রাজ্যের যেটুকু আভ্যন্তরিক শাস্তি ও শৃঙ্খলা ছিল, সিরাজদৌলার আমলে তাহা একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। নানাপ্রকার অত্যাচারে বাংলাদেশে তখন একটা মহা অশাস্ত্রিকর যুগ উপস্থিত হয় এবং যুবক সিরাজের এমন শক্তি ও ব্যক্তিত্ব ছিল না যে, তিনি সেই অশাস্ত্রিকে দমন করিতে পারেন।

নবাবী আমলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তখন হিন্দু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটা সজ্যবদ্ধ বিপ্লব-আন্দোলনের চেষ্টা হয়। ইহাই ইতিহাসে Sannasi Rebellion বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দলের নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক। কথিত আছে যে, সিরাজদৌলা রাণী ভবানীর কন্তা

পঞ্চকন্যা

তারা দেবীর কৃপের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে দেখিবার বাসনা
জানাইয়া পত্র লেখেন। রাণী ভবানী বারবার অপমান করিয়া সেই
পত্রবাহককে ফিরাইয়া দেন। রাণী ভবানী তখন মুশিদাবাদে গঙ্গার
ধারে বড়নগর রাজবাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়
সিরাজের সৈন্য আসিয়া বড়নগর আক্রমণ করে। রাণী ভবানী
তারা দেবীকে লইয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া পলাইয়া মস্তারাম বাবাজী
নামক এক সন্ন্যাসীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সন্ন্যাসীই পরে
রাণী ভবানী ও তারাবাটীকে নির্বিঘ্নে নাটোরে পেঁচাইয়া দেন।

সেই সময় শুনুর শ্বেতদীপ হইতে ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাম
লইয়া যে-সমস্ত ইংরেজ-ব্যবসায়ী ভারতের উপকূলে ব্যবসায় করিতে
আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ক্লাইভ নামক একজন সৈনিক
ভারতের চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া অন্তরে এক প্রবল বাসনা পোষণ
করে যে, এই স্বর্ণপ্রস্তু দেশে সে ইংলণ্ডের রাজ-পতাকা উড়াইবে।
ইতিহাসের পাঠকগণ জানেন, কেমন করিয়া মুষ্টিমেয় সৈন্ধের সাহায্যে
এই দেশের লোকেরই সহায়তায় ক্লাইভ এই বিরাট দেশকে
ইংলণ্ডের হাতে তুলিয়া দেন।

ক্লাইভ সিরাজদৌলাকে সিংহাসনচুত করিবার জন্য সেই সময়কার
সমস্ত শক্তিশালী লোকদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।
মুশিদাবাদে জগৎ শেষের ঐতিহাসিক-গৃহে অবশেষে বাংলার বিভিন্ন
শক্তিশালী ব্যক্তিদের পরামর্শ-সভা বসিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ৰ,
সেনাপতি মোহনলাল, রাজা নন্দকুমার, রাজবল্লভ, সেনাপতি তুলুক-
রাম, সেনাপতি মীরজাফর সকলেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।
রাণী ভবানীও চিকের আড়ালে থাকিয়া সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।
ক্লাইভ রাজ্যলোভি মীরাজফরকে যাহা বুৰাইয়াছিল, সভায় সকলে
তাহাই বিশ্বাস করিল। ক্লাইভ নিঃস্বার্থ হিতেষিগার জন্য এই কার্যে

নামিয়াছে, রাজ্যগ্রহণে তাহার কোনও আস্তি নাই। কিন্তু সেদিন চিকের আড়ালে থাকিয়া রাণী ভবানী সভার এই সিদ্ধান্তে প্রমাদ গণিয়াছিলেন। তিনিই একমাত্র সিরাজের বিরুদ্ধে ক্লাইভের সহিত ঘড়্যন্ত করিতে সকলকে বারণ করেন। তাহার মতে সিরাজকে সিংহাসনচুর্যত করিতে হইলে, অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহারাই সে কার্য করিতে পারেন।

কিন্তু সেদিন একজন রমণীর কথা গ্রাহ হয় নাই এবং তাহার ফলে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৩শে জুন পলাশীর আন্ত-ক্ষেত্রের আড়ালে হতভাগ্য সিরাজের সহিত ভারতের ভাগ্য-রবি যে অস্তাচলে গেল, কবে তাহা আবার সমুদিত হইবে কে জানে! ২৯শে জুন মাত্র সাতশত সৈন্য লইয়া বিজয়ী ক্লাইভ মুশিদাবাদে প্রবেশ করিলেন।

তারপর কয়েক বৎসর বাংলাদেশে যে অরাজকতা ও অনাচার চলিতে থাকে, তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে বিরল বলিলেই চলে। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ শক্তিশীল মোগল-সন্তান শাহ আলমের নিকট হইতে বার্ষিক ছাবিশ লক্ষ টাকা রাজকর দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ আদায় করেন। রাজকার্যে তাহারা তাহাদের ইচ্ছামত কখনও কাহাকে বসাইয়াছেন, আবার তাহাকে নামাইয়াছেন। এমনি করিয়া মৌরজাফর, মীরকাশিম প্রভৃতি বাংলার মসনদে নবাবীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া চলিয়া যান।

সেই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের অসাধুতা ও ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার ফলে বাংলার শিল্প-বাণিজ্য মুম্বু হইয়া উঠিতে-ছিল। রাণী ভবানীর রাজ্য তখন বাণিজ্য-শিল্পে বাংলার শৈষ্টান অধিকার করিয়াছিল। ইংরেজ-কুঠিয়ালগণ রাণীর রাজ্যে তাহাদের বাণিজ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং নানা ব্যাপারে রাণীর

পঞ্চকল্যা

সহিত কলহ হইতে লাগিল। যে উপায়ে বাংলার বিখ্যাত বস্ত্ৰ-শিল্প সমূলে উচ্ছিন্ন হয়, তাহার অমানুষিক অনুষ্ঠানের এই সময় সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে স্থিরভাবে রাণী আপনার কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। দরিদ্রদের সেবায় তিনি তাহার সমস্ত মন নিয়োজিত করিলেন। জলাভাব দূর করিবার জন্য উত্তর-বঙ্গের শত শত স্থানে রাণী ভবানী বৃহৎ বৃহৎ পুকুরগী খনন করাইলেন। প্রজাদের মধ্যে শিক্ষাভাব দূর করিবার জন্য তিনি বাষিক একলক্ষ টাকা সংস্কৃত-শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যয় করিতেন। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুবিয়াছিলেন যে, আর স্বাধীনভাবে মাথা তুলিয়া জমিদারী করিতে হইবে না।

১১৭৪ সালে বাংলাদেশে এক ভৌষণ অজন্মা হয়। তাহার ফলে ১১৭৬ সালে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা সমগ্র দেশকে শ্বাশানে পরিণত করিয়া দিয়া যায়। ইহাই ইতিহাসে বিখ্যাত ছিয়াত্তরের মুহূর্তের বলিয়া খ্যাত। এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া যায়। গ্রামের পর গ্রামে শ্বাশান-শিবার দিবা-চীৎকারে অকল্যাণের জয়াত্রা ঘোষিত হইত, ঘরে ঘরে শুধু গলিত শবদেহ পড়িয়া থাকিত। এই ভয়াবহ ঘৃত্য ও আসের মধ্যে রাণী ভবানীর মাতৃহৃদয় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে। আত্ম-রক্ষার জন্য তিনি সেদিন অগ্নপূর্ণার মতই বাংলার দরিদ্র প্রজাদের জন্য আবিভূতা হইয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে রাজ-বৈষ্ণ নিযুক্ত করিলেন, রাজকোষের অর্থে দীর্ঘকাল স্থায়ী শত শত অন্নসত্র খোলা হইল। প্রজাদের খাজনা মাফ করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে সেদিন অগ্নপূর্ণা-স্বরূপিনী সেই বিধবা বাঙালী ব্রতধারিণী নারী লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন রক্ষা করেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল গোয়ারেন হেষ্টিংস ভারতের সর্বপ্রথম গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসেন। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে ইংরেজ সাক্ষাৎভাবে সমস্ত ক্ষমতা আপনাদের হাতে ধীরে ধীরে সংগ্রহ করিয়া লইতে লাগিলেন। গোয়ারেন হেষ্টিংস প্রথমে কাশিমবাজারের এক ইংরেজ-বণিকের কুঠীতে সামান্য একজন কর্মচারী হইয়া ভারতে আসেন। ভারতে আসিবার পাথেয় তাহার ছিল না। একজন প্রতিবেশীর নিকট টাকা ধার করিয়া তবে তিনি ভারতে আসিতে পারেন। সেই গোয়ারেন হেষ্টিংস পরে সেই ভারতের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা রূপে পুনরায় প্রবেশ করেন।

গোয়ারেন হেষ্টিংস রাজস্ব আদায়ের নৃতন বন্দোবস্ত করিলেন। মিডিলটন, ডেকার, লরেল ও গ্রেহাম নামক চারজন ইংরেজকে লইয়া বিখ্যাত “সার্কিট কমিটি”র প্রতিষ্ঠা হয়। এই কমিটির কাজ হইল, বাংলার জমিদারদের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া সেই অরুয়ায়ী রাজস্বের পরিমাণ নিরূপণ করা। যাহারা নির্দ্ধারিত কর দিতে পারিবে না, তাহাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং নৃতন জমিদার স্থষ্টি করা হইবে। যে নদীয়ার মহারাজ একদিন সিরাজের বিরক্তে ইংরেজের সহায়তা করিয়া ভারতে ইংরেজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিও অব্যাহতি পাইলেন না। সার্কিট কমিটির নজর সর্বপ্রথম তাহারই উপর পড়িল এবং সার্কিট কমিটি বিচার করিয়া তাহার রাজস্বের পরিমাণ বাঢ়াইয়া দিলেন এবং সেইসঙ্গে জানাইলেন যে, পরিবর্দ্ধিত রাজস্ব দিতে সম্মত না হইলে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। অবশ্যে কমিটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারী হইতে কাশিম-বাজারকে বাহির করিয়া লয় এবং তাহা কোম্পানীর বিশ্বস্ত কর্মচারী কান্তবাবুকে দেওয়া হয়।

পঞ্চকন্ত্র

সার্কিট কমিটি রাণী ভবানীর রাজ্যে গিয়া সেখানে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেন ও বাহারবন্দর নামক একটি স্থুবিস্তৃত এবং লাভজনক জমিদারী রাণী ভবানীর জমিদারী হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইল এবং তাহাও কান্তবাবুকে দেওয়া হইল। কান্তবাবুর আসল নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। সামান্য অবস্থা হইতে আপনার অসামান্য সাধুতা ও চরিত্রগুণে তিনি কোম্পানীর একজন বিশিষ্ট কর্মচারী হন এবং ইনিই বিখ্যাত কাশিমবাজার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এইভাবে রাণী ভবানী অধিকারচৃত হইয়া আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন এবং আপনার দক্ষক-পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণের হাতে রাজ্যভার দিয়া তিনি পুণ্যধাম কাশীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, রাণী ভবানী রাজসাহী জেলার আমরূল পরগণার আটগ্রামের রায়-বংশের রামকৃষ্ণ রায়কে পোত্যপৃত্র গ্রহণ করেন।

কাশীতে গমন করিয়া রাণী ভবানী অন্তরের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বিশ্বের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। রাণী ভবানীর দানে ও স্নেহে চির-নগরী কাশী এক নব-কলেবর ধারণ করিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান সমাপনাত্তে তিনি একটি করিয়া প্রস্তরনির্মিত বাটী সাহিক নিষ্ঠাবান্ত্রাঙ্গণকে দান করিতে লাগিলেন। তিনি যে-কয়েক বৎসর কাশীতে ছিলেন, কথিত আছে, প্রতিদিনই এইরূপ দানকার্য করেন। তাই মনে হয়, কাশীর প্রত্যেক শিলাখণ্ডে এই বাঙালী-রমনীর অন্তরের পরিচয় মুক হইয়া পড়িয়া আছে। বাংলার অন্নপূর্ণা কাশীতে গিয়া কাশীর অন্নপূর্ণার মন্দির নির্মাণ করেন এবং সেই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহনার্থ প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করেন। কাশীর বর্তমান দুর্গাবাড়ী, তৎসংলগ্ন দুর্গাকুণ্ডনামক সরোবর কাশীর গোপালমন্দির, তারামন্দির, দণ্ডিভোজ নছত্র, মথুরাছত্র,

সমস্ত রাণী ভবানীর স্থষ্টি। ইহা ব্যতীত বহু দেবালয়, বহু অবতরণিকা কাশীতে ও বাংলাদেশে নির্মাণ করাইয়া দেন। কাশীর পঞ্চক্রোশী তীর্থের সমস্ত পথ রাণী ভবানী নির্মাণ করাইয়া দেন। পথের দুইধারে পুণ্যকাম যাত্রীদের সৃষ্ট্যকর হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৃক্ষের সারি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সমস্ত বৃক্ষ আজ মাথা তুলিয়া উদ্ধৃতোকে সেই মহীয়সী নারীর নিকট তীর্থযাত্রীদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা পৌছাইয়া দিতেছে। বাঙালীর অন্তরের সহিত কাশীর অন্তরকে তিনি এক অপূর্ব বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন।

প্রতিবৎসর নাটোরে দুর্গাপূজা হইত। সে পূজার তুলনা আর নাই। পূজার দিন প্রতিবৎসর তিনি স্বহস্তে দুই হাজার সধবাকে বন্ত্র, শঁখা ও সোনার নথ পরাইয়া দিতেন। দেবীপক্ষের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি একশত কুমারীকে বন্ত্র ও অলঙ্কারে সুশোভিত করিতেন।

কিন্তু এধারে রাজ্যশাসনের ভার দিয়া যাহাকে তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, ভগবান তাহাকে রাজ্যশাসন করিবার জন্য পাঠান নাই। মহারাজ রামকৃষ্ণ একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। অন্তরে বাহিরে, চিন্তায়, ধ্যানে তিনি ছিলেন একজন পরম বৈরাগী। রাজস্ব আদায়ে একে একে জমিদারী নীলামে উঠিতে লাগিল। তাহারই কর্ণচারীরা নীলামে সেই সমস্ত জমিদারী কিনিয়া লইতে লাগিল; আর তিনি যেই শোনেন যে, একটি একটি জমিদারী নীলামে উঠিতেছে, অমনি তিনি কালীর সম্মুখে আনন্দে ছাগবলি দিতে থাকেন; আর বলেন, বাঁচলাম, আর-একটি বন্ধন খুলিয়া গেল। সে এক অপরূপ দৃশ্য! জমিদারীর পর জমিদারী নীলামে উঠিতে থাকে, আর দেবীর পূজার ধূম ততই বাড়িয়া উঠে। বাহিরের বন্ধন যতই খসিয়া যাইতে লাগিল, মহারাজ রামকৃষ্ণের

পঞ্চকন্যা

অন্তরে বৈরাগ্য ততই প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। রাণী ভবানী
কাশী হইতে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া শুধু বলিলেন, “তুমি
সূর্যবংশের রাজাদের মত হও, আর কিছু চাহি না।”

সর্বস্পৃহাবিগত হইয়া অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী মুশিদাবাদে গঙ্গার ধারে
বড়নগরে পূজাধ্যানে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে
মহারাজ রামকৃষ্ণ গঙ্গাজলে আবক্ষ-নিমজ্জিত থাকিয়া পুণ্যমন্ত্র জপ
করিতে করিতে সজ্জানে দেহত্যাগ করেন। তাঁরপর একদিন মহা-
কালের অমোঘ নিয়মে নানা শোক-ত্বাপ অয়ান বদনে সহ করিয়া
অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী ৭৯ বৎসর বয়সে পুণ্যতোয়া গঙ্গার পবিত্র জলধারার
দিকে চাহিয়া জীবলীলা সাঙ্গ করেন। অর্দ্ধ-বঙ্গের প্রজারা সেদিন
সত্যই মাতৃহারা হয়।

—নিবেদিতা

উনিশ শতকের শেষে লঞ্চনে। পথ-ঘাট বরফে ঢাকা। তার
ভেতর দিয়ে এক তরুণী প্রত্যহ ঘায়, শহরের উপাস্তে দরিজ
শ্রমিকদের পল্লীতে... দরিজ মজুরদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া
শেখাবার জন্মে...

বই কেনবার ইচ্ছা বা সঙ্গতি তাদের নেই... তাই তরুণী নিজেই
খানকতক বই, খানিকটা খড়ি, আর একটা শ্লেষ্ট নিয়ে প্রত্যহ
এই পথে ঘায়...

মৃত্যুকালে তার ধর্ম্মাজক পিতা ব'লে গিয়েছিলেন, ঈশ্বরের
পায়ে নিবেদিত হয়ে তুমি জন্মেছো, স্বতন্ত্র তোমার জীবন... চারদিকে
বিরাট অঙ্ককার, তার মধ্যে যদি একটা প্রদীপও জ্বেল যেতে
পারো!

প্রতি মুহূর্তে তরুণী অন্তরে পিতার সেই অস্তিম আশীর্বাদকে
স্মরণ করে...

পৃথিবীতে যদি একটি প্রদীপও কোথাও সে জ্বেল যেতে
পারে!

হৃরন্ত তার জ্ঞানের পিপাসা... সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস সে
নিষ্ঠাসহকারে অধ্যয়ন করেছে...

লঞ্চনের প্রগতিশীল শিক্ষিতদের বাছাই-করা ক্লাবে, যেখানে
বার্গার্ড শ' গিয়ে বসেন, তরুণীও সেখানে আসন পায়...

লঞ্চনের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-পত্রিকায় তার প্রবন্ধ বেরোয়...
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ...

পঞ্চকন্যা

অবসর সময়ে ঘরে সে চিত্র-বিদ্যা ও স্থপতির চর্চা করে...

শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে নব-নব পদ্ধতি নিয়ে সে গবেষণা করে এবং
নিজে উপর্যাচক হয়ে দরিদ্র-পল্লীতে গিয়ে দরিদ্র শিশুদের নিয়ে
পরীক্ষা করে...

ইংলণ্ড তার জন্মভূমি নয়, তার জন্মভূমি হলো আয়ারল্যাণ্ড...
আয়ারল্যাণ্ড তখন ইংলণ্ডের বক্ষন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার
জন্যে সীন্ফীন্ আন্দোলন সুরু করেছে...

তরণী গোপনে এই সব কাজের আড়ালে সীন্ফীনের জন্যে
প্রচারকার্য করে, পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে...

তরণীর অপরূপ মন দশদিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে খুঁজছে
কোথায় আছে জীবনের মূল-কেন্দ্র ?

প্রতিদিন পথে এক তরণ যুবকের সঙ্গে দেখা হয়... যুবকের
চোখে-মুখে লেখা প্রতিভার স্বতন্ত্র স্বাক্ষর...

আলাপ হয়...

যুবকটি বলে, ওয়েলস্-দেশে তার বাড়ী... ইন্জিনিয়ারিং পড়তে
লাগেনে এসেছে... কিন্তু বাড়ী-তৈরী-করার সমস্যার চেয়ে তার
মনকে বেশী আকর্ষণ করে মাঝেরে জীবনের সব অন্তর্গৃহ সমস্যা...

তরণী বলে, আমিও ইংলণ্ডের মেয়ে নই... আয়ারল্যাণ্ড আমার
জন্মভূমি !

প্রতিদিন রাত্তায় একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তুজনের আলাপ
হয়... আলাপের ভেতর দিয়ে পরম্পর পরম্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়
... দুটি নিষ্পাপ শিশু যেমন পরম্পরাকে জড়িয়ে ধরে, তারা তুজনে
তুজনকে সেইভাবে জড়িয়ে ধরে...

জ্ঞান-সাধনায় সতীর্থ... এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য, এক পথ...

তারা স্থির করে, জীবন-সাধনায় তারা একসঙ্গেই চলবে...

পঞ্চকন্ত্রা

অকস্মাং তরুণ একদিন এক দূর নগরে চলে গেল, একটা
কারখানায় কাজের সন্ধান পেয়ে...

তরুণী অপেক্ষা ক'রে রইলো সংবাদের জন্তে...

চেলিগ্রামে সংবাদ এলো, অকস্মাং হৃদ্রোগে তরুণ পৃথিবী
ছেড়ে চলে গিয়েছে, এই খবরটি তরুণীকে জানাবার অভুরোধ ক'রে...

শৈশবে একদিন এমনি অকস্মাং তার পিতার তিরোধানের
মধ্যে ঘৃত্যকে সে দেখেছিল...

সেই থেকে তার মনের তলায় সব সময় একটা প্রশংস্য জাগতো,
ঘৃত্য কি ?

আজ জীবনের যাত্রারস্তে আবার দেখা হলো ঘৃত্যর সঙ্গে,
তেমনি অকস্মাং, তেমনি একান্ত...

তরুণীর সমস্ত অন্তর আলোড়িত ক'রে জেগে ওঠে জীবনের
মর্মান্তিক জিজ্ঞাসা, কেন এ জীবন ? কোথায় এর আরস্ত ?
কোথায় এর শেষ ? এ কি অনিন্দিষ্ট কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের
অর্থহীন উৎক্ষেপ ? একটা বাড়ের ফুৎকার ? এই পৃথিবীতে আসা
আর এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া, এর ভেতর কি কোনো সঙ্গত
মানে নেই ?

কে দেবে এর উত্তর ?

বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার তার সামনে উন্মুক্ত... দর্শনশাস্ত্র তরুণী
তন্ম তন্ম ক'রে পড়ে... কিন্তু ঘৃত পুস্তকের ঘৃত অক্ষরে তার মন
তামসী-রাতের অন্ধকারে এত্তুকুও আলো জ্বালাতে পারে না ?

পাদ্রীর ঘেয়ে সে... রক্তে তার খৃষ্টান-ধর্মের প্রতি অহুরাগ...
কিন্তু সেখানেও তার বিভ্রান্ত মন কোনো সান্ত্বনা খুঁজে
পায় না...

লগুনের সেই বিশাল জনারণ্যের মধ্যে তরুণী আকুল হয়ে

পঞ্চকন্যা।

চেয়ে থাকে, কোথায় কে আছে, যে দেবে তার অশাস্ত্র-অস্ত্রের
আর্ত-জিজ্ঞাসার উত্তর ?

এই তরুণীর নাম মার্গারেট নোবেল, যিনি ভগিনী নিবেদিতা
রূপে আজ ভারত-পূজিতা...

*

*

*

ঠিক সেই সময় লঙ্ঘনে কুমারী নোবেল শুনলেন, ভারতবর্ষ
থেকে এক অপূরুপদর্শন তরুণ সন্ন্যাসী এসেছেন,

বৈঠকখানায় তিনি ক্লাস নেন, সে-ক্লাসে যে-কোনো জিজ্ঞাসু
যোগদান করতে পারে...

নিছক কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে কুমারী নোবেল ভারত-
সন্ন্যাসীর সেই ক্লাসে সকলের পেছনে একধারে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে
থাকে...

সন্ন্যাসী বক্তৃতা দেয়...

তরুণী চোখ বন্ধ ক'রে শোনে, যেন সমুদ্র গর্জন করছে...
মাঝুষের কঢ়িস্বরে এমন আকর্ষণ থাকতে পারে সে তা কোনোদিন
কল্পনাও করতে পারেনি...

বিশেষ ইতিহাসের, দর্শনের জটিল সমস্যা সন্ন্যাসী এমনভাবে
ব্যাখ্যা করেন, তরুণী আর কোথাও কারুর লেখায় সেই স্পষ্ট প্রাণ-
উজ্জ্বল বলিষ্ঠ ভঙ্গী আর ঢাখেনি—

শুনতে শুনতে তরুণীর মনে হয়, এই সন্ন্যাসী সমস্ত বিশ্ব, তার
ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শনকে এমন একটা বিচিত্র নতুন দিক থেকে
দেখেছেন, যা বিশ্বয়কর...বিচিত্র...

সব চেয়ে বিশ্বয়কর, সেই তরুণ সন্ন্যাসীর প্রত্যয়...

এতদিন বড় বড় বক্তার, অধ্যাপকের যে-সব বক্তৃতা সে শুনেছে,

সেগুলো যেন বই-এর কথাই মুখ্য করে বলা, এই সন্ধ্যাসৌর প্রত্যেক কথা যেন তাঁর অভিভ্রতা-লক্ষ পরম সত্য...কথা নয়, আগুন...তাঁর উত্তাপ স্পষ্ট মনে এসে লাগে, অভ্রাতসারে শ্রোতার চেতনাকে রাঙিয়ে তোলে...

এ কি এক বিচ্ছিন্ন অনুভূতি !

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন-শহরের বুকে ব'সে পরাধীন ভারত-বর্ষের এক সন্ধ্যাসী বলে, এই তোমাদের লণ্ডন শহর, জগতের শ্রেষ্ঠ শহর ব'লে তোমরা গর্ব অনুভব করো ! বলতে পারো, এর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় ?

ক্লাস নীরব ।

ক্লাসের পেছন থেকে ক্ষীণ কঢ়ে তরুণী নোবেল ব'লে ওঠে, আপনি কি বলতে চান, লণ্ডনের এই শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমাদের গর্ব নির্বর্থক ?

বজ্র-কঢ়ে সন্ধ্যাসী বলে, যে-শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে তোমরা গর্ব অনুভব করছো, প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্যে চরম লজ্জিত হওয়া তোমাদের উচিত...একবার তোমরা ভেবে দেখেছো, জগতের কত শহরের আলো নিভিয়ে দিয়ে এই শহরের আলোর জৌলুষ তোমরা বাঢ়িয়েছো ?

তরুণীর বৃটিশ-রক্তে দোলা লাগে...রক্ত-গোলাপের মতন মুখ লাল হয়ে ওঠে...কিন্তু সন্ধ্যাসীকে প্রতিবাদও করতে পারে না...

বিশাল ঢুই আয়ত-চক্র নিয়ে সন্ধ্যাসী তরুণীর দিকে চায়...

সে-দৃষ্টির খর-আলোকে তরুণী চোখ নত করে...

ক্লাস শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যাসী সোজা সেই তরুণীর সামনে এসে হাত তুলে আশীর্বাদ করেন, মাই চাইল্ড, তোমরা ইংরেজ, দ্বীপে বাস করো...তাই তোমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে...

পঞ্চকন্তা

চোখ তুলে আরো দূরের দিকে চাও, তখন সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে
মিলিয়ে নিজেদের দেখতে পাবে !

মাই চাইল্ড !

তরুণীর কুকু অন্তরের সমস্ত বিদ্রোহ নিমেষে যেন মিলিয়ে
যায়... মনে হয় সারা দেহে কে যেন মাতৃ-স্পর্শের মতন স্নিগ্ধ স্পর্শ
বুলিয়ে দিলো...

নত হয়ে সন্ধ্যাসীর পায়ের তলায় প'ড়ে শুধু বলে, মাই মাট্টার,
My master !

সেইদিন জগতে সৃষ্টি হলো একটি অপরূপ মানবীয় সম্বন্ধ...
যার তুলনা জগতের ইতিহাসে খুব বেশী নেই !

সেইদিন মার্গারেট নোবেলের মধ্যে জন্মালো এক বিচিত্র নারী,
যার চরিত্রের বিচিত্র সুরভি মানুষের-জানা ইতিহাসে খুবই বিরল...

*

*

*

বিবেকানন্দ তাঁর নিজের দেশের নারীদের কথা বলেন...

যে-সন্ধ্যাসীর মুখে কোনো ব্যক্তিগত কথা কেউ শোনেনি, হঠাৎ
একদিন ক্লাসে তিনি বলেন, তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে,
আমার নিজের ভগী আত্মহত্যা করে... সে-ব্যথা সন্ধ্যাসী হয়েও আমি
ভুলতে পারিনি... তাই আমি পণ করেছি, আমার দেশের মেয়েরা
আজ যে অসহায় অঙ্ককারে প'ড়ে আছে, সেখান থেকে তাদের
আমি নব-জীবনের আলোয় টেনে তুলবো... মেয়েরা না জাগলে,
কোনো জাত জাগতে পারে না... আমার ভারতবর্ষ মহাদেশ, বিরাট
তাঁর আয়তন... লক্ষ লক্ষ নারী এই বিরাট আয়তনের মধ্যে অশিক্ষিত
আর কুসংস্কার আর লোভী পুরুষের স্বার্থপরতার বন্ধনে অসহায়
মুড়ির মতন প'ড়ে আছে... অথচ আমি জানি, আমাদের দেশের এই

পঞ্চকল্প

অশিক্ষিত মেয়েদের মনে এমন ঐশ্বর্য স্ফুল হয়ে আছে, যাকে
জাগাতে পারলে জগতে মহাশক্তির অভ্যন্তর হতে পারে!

মার্গারেট একান্ত-মনে সন্ন্যাসীর প্রত্যেকটি কথা শোনে... তার
চোখের সামনে ফুটে ওঠে কল্পনার এক ভারতবর্ষ!

সন্ন্যাসী বলেন, আমি সারা জগৎ-জুড়ে খুঁজছি একটি মেয়ে,
এই পাঞ্চাত্য দেশের প্রাণ-ধর্মী একটি মেয়ে, যে এই বিরাট কাজে
আমার সহায় হতে পারে... আমি খুঁজছি সেই মেয়েকে, সিংহিনীর
মতন যার তেজ...

সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন, তার আয়োজন চলছে...

নীরবে মার্গারেট এসে সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়ায়...

স্থির, দৃঢ়কষ্টে বলে, তোমার পাশে থেকে তোমার কাজে সাহায্য
করবার অধিকার আমাকে দাও...

সন্ন্যাসী কয়েক মুহূর্ত স্তুতি থেকে বলেন, আমার কোনো আপন্তি
নেই... কিন্তু এ কাজ কত দুরহ তা তোমার ধারণা নেই... তাই
কোনো আবেগের বশবর্তী হয়ে আমার সঙ্গে আসতে চেয়ে না...
ধীর স্থির ভাবে ভাবো, এ মহা-দায়িত্বের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত
ক'রে তোলো... আর যদি কোনোদিন ভারতবর্ষে আসো, একটা
কথা কথনো ভুলো না. আমি সন্ন্যাসী !

কান্নায় ভেঙে পড়ে মার্গারেট...

সন্ন্যাসী ফিরে আসেন তাঁর স্বদেশে...

*

*

*

যিশুর মূর্তির দিকে চেয়ে প্রার্থনা করতে গিয়ে মার্গারেটের
চোখের সামনে ফুটে ওঠে জ্যোতিষ্ঠান ভারত-সন্ন্যাসীর মূর্তি !

পঞ্চকন্যা

নিজায়, স্বপ্নে, জাগরণে, চেতনায় প্রতি মুহূর্তে অন্তর থেকে ওঠে
সেই এক কথা, তুমি আমাকে স্বীকার করো আর নাই করো,
আমার জীবন প্রদীপের মতন তোমার পায়েই জলবে...আমার
জীবনে তুমিই একমাত্র প্রভু, মাই মাষ্টার !

ভারত-নারীর শিক্ষার উন্নতির জন্যে লগ্ননের পথে পথে ঘুরে
চাঁদা সংগ্রহ করে...

সেই বৃটিশ-তরুণীর বিচিত্র ভারত-প্রেম দেখে লোকে উপহাস
করে...

তরুণী নিয়মিত সন্ধ্যাসীকে চিঠি লেখে, প্রত্যেক চিঠিতে সে
জানাতে চেষ্টা করে, ভারত-নারীর শিক্ষার জন্যে সে তার সমগ্র
জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত...নানা রকমের স্কীম উন্নাবন ক'রে
লিখে জানায়...

কিন্তু উন্নতে সন্ধ্যাসীর কাছ থেকে কোনো আহ্বান পায় না,
কোনো আমন্ত্রণ নয়...ভারতবর্ষে যাওয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে সন্ধ্যাসী
একেবারে নির্দত্ত...তবুও স্বল্পাক্ষর সেই উন্নতের ভেতর মার্গারেট
স্পষ্ট অনুভব করে একটা অব্যক্ত বিরাট স্নেহের অপূর্ব প্রাণ-দায়ী
উত্তাপ...

মার্গারেট চেয়ে থাকে ভারতবর্ষের দিকে...

অবশেষে একদিন এলো আহ্বান...

“যে-কাজের জন্যে তুমি ভারতবর্ষে আসছো, সে-সম্বন্ধে তোমার
মনে যেন কোনো কান্ননিক অতিশয়তা না থাকে...কোনো সাহায্য
পাবে না, কোনো সহযোগিতা পাবে না...উল্টে প্রতি পদে বাধা
পাবে...এমন কি, বিদেশিনী ব'লে লাঞ্ছনা পাবে...তোমার ছেঁয়া
কোনো জিনিস হয়তো মেয়েরা ছেঁবে না...তবুও যদি আসতে
অন্তর থেকে প্রেরণা পাও, এসো...

পঞ্চকন্যা

যদি আসো, আমার দিক থেকে একটা কথা তোমাকে
জানাচ্ছি...তুমি হিন্দু হও আর না হও, বেদান্ত প্রহণ করো কিন্তু
নাই করো, বিবেকানন্দ যতদিন জীবিত থাকবে...ততদিন সে
তোমার পাশেই থাকবে...হাতীর দাঁত সংকুচিত হয় না, পুরুষের
উচ্চারিত কথাও আর সংকুচিত হয় না..."

এ আহ্বানের পর কে আর ব'সে থাকে ?

সব পেছনে ফেলে রেখে মহানন্দে মার্গারেট স্বপ্ন-তীর্থ ভারতের
দিকে যাত্রা করেন...

* * *

জাহাজ-ঘাটে নামতেই মার্গারেট দেখেন, স্বামী বিবেকানন্দ
নিজে তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছেন...

একটা ঘোড়ার গাড়ী ক'রে তাঁরা পার্ক সার্কাসের কাছে এক
বাড়ীতে উঠলেন...

গাড়ীতে মার্গারেট অনগ্রহ প্রশ্ন করেছেন বেলুড় সম্বন্ধে...তাঁদের
আশ্রম সম্বন্ধে...কিন্তু তাঁর আকুল-জিজ্ঞাসার উত্তরে সন্ধ্যাসী একান্ত
নির্লিপ্তভাবে যথাসন্তুষ্ট স্বল্পাক্ষরে উত্তর দিয়েছেন...

গাড়ী থেকে নামতেই মার্গারেট প্রশ্ন করেন, এইটে কি বেলুড় ?

স্বামীজি বলেন, না, বেলুড় এখান থেকে অনেক দূরে...তুমি
আপাতত এই বাড়ীতেই থাকবে...একজন সন্ধ্যাসী এসে তোমার
খবরাখবর নেবে আর তিনিই তোমাকে বাংলা ভাষাটা শেখাবেন...
এখানে কোনো অস্ববিধাই তোমার হবে না...তার সব বন্দোবস্তই
করা আছে...আপাতত তুমি বিশ্রাম করো...আমাকে এখনিবেলুড়ে
ফিরে যেতে হবে !

আশীর্বাদ ক'রে সন্ধ্যাসী চলে যান...

পঞ্চকন্ত্রা

মার্গারেট ভেতর থেকে কেমন স্তন্ত্রিত হয়ে যান... এতদিন, এত
আগ্রহে অপেক্ষা করার পর আজ তিনি যখন এলেন, কই, স্বামীজির
মুখে, স্বামীজির কথায় কোথাও তো বিন্দুমাত্র কোনো আগ্রহের
চিহ্ন নেই !

অথচ এই লোককে তিনি লঙ্ঘনে দেখেছেন, প্রত্যেক কথার
পেছনে একটা অগ্নি-উত্তাপ...

যে-চিঠির ওপর নির্ভর ক'রে সব ফেলে দিয়ে তিনি ছুটে এসেছেন,
তার প্রত্যেক অঙ্করে ছিল প্রাণের জলস্ত শিখ...

আর এ কাকে তিনি দেখলেন ? সম্পূর্ণ নির্লিপি উদাসীন এক
সন্ধ্যাসী... সাত-সাগর পেরিয়ে তাঁর এই আসা তাঁর কাছে যেন
প্রতিদিনের স্বাভাবিক ঘটনা ।

বেলুড়ে তাঁর কাছে থাকবার জন্মেই তিনি এসেছেন... অথচ
এখানে তাঁকে রেখে তিনি বেলুড়ে চলে গেলেন ! কত কথা তাঁকে
বলবার ছিল, কত পরিকল্পনার কথা... কোনো প্রশ্নই করলেন না
সে-সম্বন্ধে !

পাঞ্চাত্য তরণী রমণীর অস্তর সুতীর্ব হতাশায় যেন ভেঙে পড়ে...
কিছুই বুঝতে পারেন না ?

কোথায় বেলুড় ?

কেন স্বামীজি তাঁকে এত দূরে সরিয়ে রাখলেন ?

লঙ্ঘনে স্বর্য-সম প্রভ-দৌপ্ত্ব যে স্বামীজিকে দেখেছিলেন, এ তো
সে ব্যক্তিস্বীকৃত নয় ! এ যেন ভাবরেখাইন উত্তাপহীন এক পাথরের
মাতৃষ !

মার্গারেট এক অব্যক্ত ব্যথায় ভেঙে পড়েন...

পঞ্চকন্যা

*

*

*

মার্গারেট লক্ষ্য করেন, দূর থেকে স্বামীজি তাঁর প্রত্যেকটি
প্রয়োজনের নিখুঁত খবরাখবর নেন् অথচ সামনে তাঁকে দেখতে
পান না...

একজন ব্রহ্মচারী নিয়মিত বেলুড় থেকে আসেন... একান্ত ভদ্র,
বিনয়ী, শান্ত... তাঁকে বাংলা ভাষা শেখান।

মার্গারেট স্বামীজি সন্ধে নানান প্রশ্ন তাঁকে করেন...

ব্রহ্মচারী একান্ত শ্রদ্ধায় স্বামীজির, স্বামীজির গুরুর সব কথা
তাঁকে গল্ল ক'রে শোনান...

সেই অপূর্ব কথা শুনতে শুনতে মার্গারেটের মনে দুরস্ত পিপাসা
জেগে ওঠে, যেখানে স্বামীজি আর তাঁর গুরু-ভায়েরা থাকেন,
সেখানে তিনি থাকতে পারেন না কেন?

মিসেস্ সারা বুল তখন বেলুড়ে ছিলেন... মাঝে মাঝে মার্গারেটের
সঙ্গে দেখা করতে আসতেন...

মার্গারেট তাঁর কাছে কেঁদে পড়লেন...

মিসেস্ সারা বুলের আবেদনে মার্গারেট বেলুড়ে তাঁদের সঙ্গে
থাকবার অনুমতি পেলেন...

মাঝে মাঝে স্বামীজি আসেন... নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা
করেন... কিন্তু মার্গারেট যখনই নারী-শিক্ষার কথা উত্থাপন করেন,
স্বামীজি যেন সে-কথা শুনতেই পান না... যে-কাজের জন্যে এত
আগ্রহে তিনি তাঁকে আহ্বান ক'রে আনলেন, সে-কাজের কোনো
কথাই তিনি উত্থাপন করেন না...

কতদিন এই রকম নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকবেন।

স্বামীজির কাছ থেকে কোনো উত্তরই পান না...

পঞ্চকন্যা।

একদিন গঙ্গার ধারে স্বামীজির সঙ্গে বেড়াতে মার্গারেট
আবার সেই কথার উত্থাপন করেন... তিনি যে-কাজের জন্যে এলেন
সে-সম্বন্ধে কোনো উৎসাহই তো পাচ্ছেন না !

গন্তীরকষ্টে স্বামীজি বলেন, ভারতের শ্রীলোকদের শিক্ষা দেবার
মতন উপযুক্ততা কি অর্জন করেছো ?

মার্গারেট আহত বোধ করেন...

স্বামীজি বলেন, তোমাকে মনে-প্রাণে ভারত-নারী হতে
হবে... এমন কি তার মন নিয়ে তার কু-সংস্কারকে দেখতে-বুঝতে
হবে... যদি তা পারো, তবেই ভারত-নারীর শিক্ষার দায়িত্ব নিতে
পারো !

—কি ভাবে তা সম্ভব হতে পারে ?

—তুমি যে ইংলণ্ডের মেয়ে, তোমার স্মৃতি থেকে তা মুছে
ফেলতে হবে... এক দেহে তোমাকে নিতে হবে জন্মান্তর ! আদর্শ
হিন্দু-বিধবা যে জীবন যাপন করে, তোমাকে সেই জীবন স্বেচ্ছায়
গ্রহণ করতে হবে !

স্মৃত হয় মার্গারেটের জীবনের এক কঠোর সাধনা...

হিন্দু-বিধবার মতন এক-বসনে থাকেন, ভূমি-শয্যায় শয়ন
করেন, একবেলা স্বহস্তে হবিজ্ঞান পাক ক'রে গ্রহণ করেন...

স্বামী সত্যানন্দের নির্দেশে অক্ষর ধ'রে পালন ক'রে চলেন
নৈষ্ঠিক-বিধবার জীবন...

তবুও এক জায়গায় তাঁর মনের গহনে এক গভীর ক্ষোভ
থেকে যায়... যে-গুরুর বাণীকে আশ্রয় ক'রে তিনি নতুন ক'রে তাঁর
জীবন গড়ে তুলছেন, প্রতিদিনের জীবনে কোথাও তাঁর সঙ্গে এতটুকু
মানবীয় সম্পর্কের স্থিয়োগ পান না... লণ্ডনে যাকে দেখেছেন একান্ত
মেহশীল, এখানে তাঁকে যেন দেখেছেন পাথরের মাঝুষ, মুখে বা

পঞ্চকন্যা

কথায় কোনো ব্যক্তিগত আবেগের চিহ্ন নেই... বরঞ্চ মনে হয়,
তিনি যেন ইচ্ছা করেই তাঁর সংসর্গ থেকে দূরে থাকছেন...

গভীর অভিমানে মার্গারেটের অন্তর ভ'রে ওঠে...

এমন সময় স্বামীজি মার্গারেটের দীক্ষার ব্যবস্থা করলেন...

মার্গারেটের মন আনন্দে ভ'রে উঠলো...

দীক্ষা অন্তে স্বামীজি তাঁর নতুন নামকরণ করলেন, নিবেদিতা !

বহু জিনিস যা আগে দুর্বোধ্য লাগতো, ক্রমশঃ তা আর দুর্বোধ্য
লাগে না। কিন্তু গুরুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্বরূপটা ঠিক বুঝতে
পারেন না...

ধীরে ধীরে স্বামীজি তাঁকে বোঝালেন যে, গুরুর সঙ্গে কোনো
ব্যক্তিগত সম্পর্ক সন্তুষ্ট নয়... গুরু ব্যক্তি নয়, গুরু আদর্শের শক্তি,
ঈশ্বরের প্রতীক...

বুঝলেও অন্তরে কোথায় থেকে যায় একটা সুগভীর শূন্ততা...
সে-শূন্ততার বেদনা দূর ক'রে দিলেন জননী সারদামণি...

নিবেদিতাকে কাছে টেনে নিয়ে সুগভীর স্নেহে তিনি বললেন,
কে বলছে গুরুকে ভালোবাসবে না? আমি যেমন সব মন-প্রাণ
দিয়ে ঠাকুরকে ভালোবাসি, তেমনি একান্তভাবে ভালোবাসো
তোমার গুরুকে !

মায়ের আশীর্বাদে নিবেদিতা পরম-আনন্দে নিজের সর্বস্ব নিবেদন
করেন গুরুর চরণে...

চরম-নিবেদনে শান্ত হয়ে যায় চাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব..

প্রকাশিত হয়েছে—

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের আলোকাভিসার ... ২০০ প্রেমেন্দ্র মিত্রের যথন বাতাসে নেশা ... ২০০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বনেত্রা ... ২০০ বুদ্ধদেব বসুর হই চেউ, এক নদী .. ২৫০	হেমেন্দ্রকুমার রায়ের প্রিয়া ও প্রিয় ... ২৫০ কুবের পুরীর রহস্য ... ১৫০ (ছোটদের উপন্যাস) অভাব বক্তুমাখা ... ১৫০ (ছোটদের উপন্যাস)
	নৃপেন্দ্ৰকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চকণ্ঠা ... ২০০
	আশাপূর্ণী দেবীর জনম-জনমকে সাথী ... ৮০০ প্রথম লগ্ন ... ২০০
	প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর চিৱাঙ্কবী ... ২০০ বউ কথা কও ... ২০০ প্রথম মিলন ... ২০০
	কিৱীটিকুমার পালের নতুন জীবন স্মৃতি ... ২০০ হে মোৰ বাকবী ... ২০০
	‘উজ্জ্বল’-এর বিশেষ সংস্করণ তারাশঙ্কর, বনফুল প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, আশাপূর্ণী দেবী... মনোবীণা ... ৮০০ ধূপচায়া ... ৫০০ অভিসার ... ৮৫০ মণি-মঞ্জুরী ... ৩০০
	উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

ব্রক সি, রুম ৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২